POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى
رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসুলের আনুগত্য কর এবং সাবধান থাক। অতঃপর, যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আমাদের রসুলের উপর দায়িত্ব শুধু মাত্র স্পষ্টভাবে (পয়গাম) পোঁছাইয়া দেওয়া। (আল মায়েদা: ৯৩)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 25

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 23 ই জুন, 2022 22 জুল কাআদা 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সাহাবাগণ নিজেদের ব্যবসা বাণিয্যে পুরো সততা ও বিশ্বস্ততা অবলম্বন করতেন

১৪৮০) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন:

এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষ এ বিষয়ের পরোয়া করবে না যে তার উপার্জন বৈধ না কি অবৈধ।

ব্যাখ্যা: এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত যায়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্‌ শাহ সাহেব (রা.) বলেন- مَنْ لَّمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ সেই ব্যক্তির ব্যবসা বরকতমণ্ডিত হয় না যে তার ব্যবসায় বৈধ ও অবৈধ নিয়ে ভ্রুক্ষেপ করে না। এমন যুগ আসবে যখন মানুষ হালাল ও হারামের পরোয়া করবে না-আঁ হযরত (সা.) যে যুগে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি করেছেন, সেই সময় সাহাবারা নিজেদের ব্যবসা বাণিয্যে পুরো সততা ও বিশ্বস্ততা অবলম্বন করতেন যা আঁ হযরত (সা.)-এর প্রশিক্ষণের পরিণাম ছিল।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল বুয়ু)

জুমআর খুতবা, ২০ মে, ২০২২
ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।
প্রশ্নোত্তর পর্ব
হুযুরের সফর বৃত্তান্ত

শোন! কুরআন শরীফ কি বলেছে- إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ আল্লাহ্‌ তা'লা মুত্তাকীদের দোয়া কবুল করেন। যারা মুত্তাকী নয়,তাদের দোয়া কবুলীয়াতের পোশাক বিবর্জিত।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

আমি অনেক লোককে বলতে শুনেছি, 'আমরা অনেক দোয়া করেছি, কিন্তু সেগুলির কোনও পরিণাম আসে নি।' আর এর পরিণাম তাদেরকে নাস্তিক বানিয়ে দিয়েছে। আসল কথা হল, প্রত্যেক কাজের কিছু নিয়ম রয়েছে। অনুরূপভাবে দোয়ার জন্য নিয়ম নির্ধারিত আছে। যারা বলে তাদের দোয়া কবুল হয় নি, এর কারণ হল তারা সেই সব নিয়ম ও পর্যায়ক্রমকে গুরুত্ব দেয় না যেগুলি দোয়া গৃহীত হওয়ারজন্য জরুরী।

আল্লাহ্‌ তা'লা যখন এক অনন্য ও অমূল্য ধনভাণ্ডার আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন আর আমাদের মাঝে প্রত্যেকেই তা পেতে পারে। কেননা, খোদা তা'লাকে সর্বশক্তিমান খোদা হিসেবে স্বীকার করেও যদি একথা বলি যে যা কিছু আমাদের সামনে রাখা আছে আর যা কিছু আমাদের দেখানো হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মায়া- এমনটি করাও যুক্তিযুক্ত নয়। এমন বিভ্রান্তিও মানুষকে ধ্বংস করে দিতে পারে। না, বরং প্রত্যেকে এই ধনভাণ্ডার অর্জন করতে পারে আর আল্লাহ্‌ তা'লার নিকট কোনও কিছুর অভাব নেই। তিনি প্রত্যেককেই ধনভাণ্ডার দিতে পারেন, তবুও তাঁর ভাণ্ডার থেকে কিছু হ্রাস পাবে না।

বস্তুত, তিনি আমাদেরকে নবুয়তের পরাকাষ্ঠাও দিতে প্রস্তুত আছেন, যদি আমরা গ্রহণ করার জন্যও চেষ্টা করি। অতএব, স্মরণ রেখো, এটা শয়তানী কুমন্ত্রণা ও প্রবঞ্চনা যা এমনভাবে দেওয়া হয় যেন মনে হয় যে দোয়া গৃহীত হয় নি। বস্তুত তারা দোয়া কবুল হওয়ার নিয়ম ও উপকরণ থেকে সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত। এই কারণে স্বর্গলোকের দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত হয় না। শোন! কুরআন শরীফ কি বলেছে- إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (আল মায়েদা-২৮) আল্লাহ্‌ তা'লা মুত্তাকীদের দোয়া কবুল করেন। যারা মুত্তাকী নয়,তাদের দোয়া কবুলীয়াতের পোশাক বিবর্জিত। তবে আল্লাহ্‌ তা'লার রবুবিয়্যত এবং রহমানিয়্যত তাদের প্রতিপালনের কাজ করছে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৭)

উলুল আলবাব' (বিবেকবানরা) চিরন্তন জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে।

তাদের পিতা মাতা এবং সন্তানসন্ততিদের মধ্যে যারা পুণ্যবান তারাও জান্নাতে তাদের সঙ্গে থাকবে, যদি তারা মুক্তিপ্রাপ্ত হয়।

এই সত্যকে কেবল কুরআন করীমই বর্ণনা করেছে, পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থ এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে নি।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা রাআদ এর ২৪ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন:

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'উকবাদ দার' বলতে বোঝানো সেই জান্নাতসমূহকে যা চিরন্তন বা বোঝানো হয়েছে যে 'উলুল আলবাব' (বিবেকবানরা) চিরন্তন জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে।

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ আর তাদের পিতামাতা এবং সঙ্গী এবং পুণ্যবান সন্তানরাও তাদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই আয়াতে এক মহান সত্য উন্মোচিত হয়েছে। এই সত্যকে কেবল কুরআন করীমই বর্ণনা করেছে, পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থ এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে নি। পৃথিবীকে কোন ব্যক্তি এমন কোন পুণ্য বা পাপ করে না যার সঙ্গে অন্য কোন মানুষ কোন না কোন ভাবে জড়িত থাকে। ব্যবসায়ীর সফলতা, কৃষকের চাষাবাদের সফলতার সঙ্গে শত শত অন্যান্য মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা জড়িত আছে। এই কারণেই ইসলামের শরিয়ত যাকাত নির্ধারণ করার মাধ্যমে অন্যদের অধিকার প্রদান করেছে। অন্যান্য কাজেও এই একই নিয়ম প্রজোয্য। যেমন ধর, এক ব্যক্তি তবলীগের জন্য বের হল, তার সেই তবলীগে তার স্ত্রীরও অবদান আছে। কেননা সে তার অনুপস্থিতিতে পরিবার ও সন্তান সন্ততির খেয়াল রাখে, তাদের লালন পালন করে। যদি সন্তানদের আগলে না রাখলে তবলীগে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভীষণ অসুবিধা সৃষ্টি হবে। অনুরূপভাবে পিতামাতা যদি সঠিকভাবে সন্তানদের লালন পালন না করত তবে সে কিভাবে ধর্মের কাজে অংশগ্রহণ করবে। কিম্বা সন্তানেরা যদি পিতামাতাকে শান্তিতে বসতে না দেয়, তবে কিভাবে পুণ্যকর্মে অংশ

এরপর ৭ পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হযরত আয়েশা (রা.)-এর রুখসাতানা এবং বয়স সম্পর্কে আলোচনা।

মূল: সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম. এ. (রা.)

হযরত আয়েশা (রা.)-এর রুখসাতানা।

হযরত খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর আঁ হযরত (সা.) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর সঙ্গে বিবাহ করেন। এটি ছিল দশম নববী সালের শওয়াল মাস। সেই সময় হযরত আয়েশার বয়স সাত বছর ছিল। কিন্তু বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে, ঐ বয়সেই তাঁর দৈহিক বিকাশ অসাধারণ ছিল। অন্যথায় খাওলা বিনতে হাকীম, যিনি এই বিবাহের প্রণোদনা জুগিয়েছিলেন, আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে বিবাহের জন্য তাঁর দিকে মোটেই দৃষ্টি যেত না। যাইহোক তিনি তখনও সাবালিকা হয়ে ওঠেন নি, তাই সেই সময় নিকাহ হল ঠিকই, কিন্তু রুখসাতানা হল না। আর তিনি যথারীতি নিজ পিতৃগৃহেই ছিলেন। কিন্তু হিজরতের দ্বিতীয় বছরে, যখন কি না তাঁদের বিবাহের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন তাঁর বয়স হয়ে দাঁড়াল ১২ বছরে আর তিনি সাবালিকা হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময় হযরত আবু বাকার স্বয়ং আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে রুখসাতানার জন্য অনুরোধ জানান। অনুরোধ মেনে আঁ হযরত (সা.) মোহর প্রদানের ব্যবস্থা করেন। (তৎকালীন যুগে মোহর নগদ দেওয়ার প্রথা ছিল)। এইরূপে দ্বিতীয় হিজরীর শওয়াল মাসে হযরত আয়েশা (রা.) পিতৃগৃহকে বিদায় জানিয়ে আঁ হযরত (সা.)এর স্ত্রী হিসেবে তাঁর গৃহে প্রবেশ করেন।

রুখসাতানার সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স কত ছিল এই প্রশ্নটি বর্তমান যুগে একটি বিতর্কিত প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। ইতিহাসের সাধারণ গ্রন্থে এবং হাদীসে হযরত আয়েশার বয়স নয় বা দশ বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি সহী বুখারীতে স্বয়ং হযরত আয়েশার বরাতে উল্লেখ বর্ণনা পাওয়া যায় রুখসাতানার সময় আমার বয়স ছিল মাত্র নয় বছর। আর এই কারণেই সিংহভাগ ইতিহাসবিদ তাঁর বয়স নয় বছর বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর বিপরীতে আধুনিক যুগের কিছু গবেষক বিভিন্ন যুক্তি দ্বারা চৌদ্দ বছর এমনকি ষোল বছর পর্যন্ত বয়স ছিল বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। যদিও আমি গবেষকদের মতের সঙ্গে সহমত নই, কিন্তু পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে নয় বছর বয়স অনুমান করাও সঠিক নয়। যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে, রুখসাতানার সময় হযরত আয়েশা (রা.)এর বয়স পুরো ১২ বছর প্রমাণ হয়। প্রকৃতপক্ষে অতীতের আলেমগণ কেবল একটি মাত্র কারণে হযরত আয়েশার বয়স নিরূপণ করতে ভুল করেছেন। তাঁরা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হযরত আয়েশার দ্বারা নয় বছরের অনুমাণটিকে নিশ্চিত ধরে নিয়ে অন্য কোনও বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেন নি।কিন্তু প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই অনুধাবন করতে সক্ষম যে হাদীসের কোনও রেওয়ায়েত সঠিক হওয়া এক বিষয় আর অনুমান সঠিক হওয়া আরেক বিষয়। অর্থাৎ যে রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত আয়েশা তাঁর রুখসাতানার সময় বয়স ৯ বছর ছিল বলে অনুমান করেছেন তা হয়তো রেওয়ায়েত হিসেবে ত্রুটিমুক্ত হতে পারে। কিন্তু হযরত আয়েশার এই অনুমানটিই নির্ভুল নাও হতে পারে। যেমনটি অনেক সময় মানুষের নিজের বয়সের অনুমান ভুল হয়ে যায়। অপরদিকে নয় বছর বয়সের অনুমানটিকে ভুল মনে করে যারা অবাধ গবেষণা করতে চেয়েছেন, তারা গবেষণার সরল ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত পন্থা ছেড়ে এমন এক জটিল প্রক্রিয়া অবলম্বন করার ভুল করেছেন যা কাউকে আশ্বস্ত করতে পারে না। প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, সেই সময় হযরত আয়েশার নিরূপণ করার সব থেকে নির্ভরযোগ্য এবং সহজ পদ্ধতি হবে যদি আমরা জন্ম তারিখ এবং বিবাহের তারিখ জানতে পারি। কেননা এই দুটি তারিখ নিরুপণ করতে পারলেই রুখসাতানার সময়কার বয়স নিয়ে কারো মনে কোনও সংশয়ের অবকাশ থাকবে না। তাই প্রথমে আমরা জন্মের বিষয়টি নিব। ইবনে সাআদ তাবাকাত গ্রন্থে একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন-'*কানাত আয়েশাতু উলেদাতিস সানাতার রাবিয়াতা মিনান নবুয়্যতি ফি আওয়ালিহা'।* অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) ৪র্থ নববী সালের প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন।" হযরত আয়েশার জন্ম তারিখ সম্পর্কে এই একটি মাত্র রেওয়ায়েত ছাড়া কোথাও অন্য কোনও সুনির্দিষ্ট হাদীস প্রারম্ভিক যুগের কোনও ইতিহাস গ্রন্থে অন্তত আমার চোখে পড়ে নি আর হাদীসের কোনও গ্রন্থেও এ সম্পর্কে কোনও বর্ণনা পাওয়া যায় না। অতএব, হযরত আয়েশার জন্মতারিখ সহজেই বের করা গেল আর সেটি হল ৪র্থ নববী সালের শুরু।

এখন আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নের দিকে আসছি যা রুখসাতানা তারিখের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। অবশ্য এক্ষেত্রে রেওয়ায়েতসমূহের মাঝে মতভেদ আছে। কিছু রেওয়ায়েতে ১ম হিজরীর শওয়াল মাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর কিছু রেওয়ায়েতে ২য় হিজরীর শওয়াল মাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু চিন্তা করে দেখলে শেষোক্ত রেওয়ায়েতটি বেশি সঠিক বলে মনে হয়। শওয়াল মাস, ১ম হিজরীর রেওয়ায়েতের আসল উৎস হল ইবনে সাআদ যার থেকে বর্ণনাকারীদের শৃঙ্খলা হযরত আয়েশা পর্যন্ত পোঁছেছে। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ইবনে সাআদ বর্ণিত এই হাদীসটি উপর ভিত্তি করেই ১ম হিজরীর শওয়াল মাসকে রুখসাতানার তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু যদিও ইবনে সাআদ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, তবে এই বর্ণনা শৃঙ্খলার একজন বর্ণনাকারী হল ওয়াকিদি যার সম্পর্কে অধিকাংশ উলেমার মত যে তাকে বিশ্বাস করা যায় না, এমনকি সে মিথ্যাবাদীও বটে। কাজেই একমাত্র ওয়াকিদির বর্ণনার উপর ভিত্তি করে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার ভিত্তি রাখা যেতে পারে না, যখন কি না অন্যান্য রেওয়ায়েতগুলি এর বিরুদ্ধে রয়েছে। এর বিপরীতে আল্লামা নওবী, আল্লামা আইনি এবং কাসতালানি এবং কতিপয় অন্যান্য গবেষকরা ২য় হিজরীর রেওয়ায়েতটি সঠিক হিসেবে গণ্য করেছেন এবং সেটিকে প্রধান্য দিয়েছেন। আল্লামা নওবী জোর দিয়ে লিখেছেন যে এই রেওয়ায়েতের মোকাবেলায় ১ম হিজরীর রেওয়ায়েতটি দুর্বল এবং বাতিলযোগ্য। যেহেতু অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ১ম হিজরীর হাদীসটির উল্লেখ করেছেন তাই এর উপর ভিত্তি করে অধিক মজবুত মতটিকে প্রত্যাখ্যান করব, এমন কোনও কারণ নেই। বস্তুত অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ওয়াকিদির বর্ণনাটিকে এই কারণে গ্রহণ করেছেন যে সহীহ হাদীসেস বর্ণিত নয় বছরের অনুমান ভিত্তিক হাদীসটির সঙ্গে এর বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। যারকানির ন্যায় গবেষক স্পষ্ট লিখেছেন- ২হিজরীর রেওয়ায়েতটি এজন্য গ্রহণযোগ্য নয়, এই হাদীসটি গ্রহণ করলে বয়স নয়ের বেশি দাঁড়ায়। অথচ যেখানে বয়স নিয়েই বিতর্ক আর বয়স সংক্রান্ত রেওয়ায়েতগুলি আতস কাঁচের নীচে রয়েছে, সেখানে বিশেষ কোনও রেওয়ায়েতকে সঠিক ধরে নেওয়া উচিত হবে না। আর যেমনটি আমি উপরে বর্ণনা করেছি, নয় বছর বয়সের অনুমানকে ভুল হিসেবে ধরার এই অর্থ নয় যে, সেই রেওয়াতটিও ভুল। আবার অবাক করার বিষয় হল স্বয়ং আল্লামা যারকানি অপর এক স্থানে শওয়াল ২য় হিজরীর হাদীসটির বর্ণনাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। এমতাবস্থায় ১ম হিজরীর হাদীসটিকে দ্বিতীয় হিজরীর হাদীসের উপস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য মনে করার কোনও কারণ নেই। আর বাস্তবেও মনে হচ্ছে যে হযরত আয়েশার রুখসাতানা ২য় হিজরীতে সম্পন্ন হয়েছিল।

এখন যেহেতু আমরা জন্ম ও রুখসাতানার তারিখ নির্ধারণ করতে পেরেছি, তাই রুখসাতানার সময় বয়স কত ছিল তা বের করা কঠিন হবে না। এটা সাধারণ একটা অঙ্ক যা শিশুরাও সমাধান করতে পারে। হযরত আয়েশা ৪র্থ নববীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন আর আঁ হযরত (সা.)-এর হিজরত হয় ১৪ নববীর রবিউল আওয়াল মাসে। এইরূপে হিজরত পর্যন্ত হযরত আয়েশার বয়স ছিল ১০ বছর কয়েক মাস। আর ১ম হিজরীর রবিউল মাসে সংঘটিত হিজরতের পর থেকে ২রা হিজরী শওয়াল মাস পর্যন্ত, যখন হযরত আয়েশার রুখসাতানা হয়, দুই বছরের কিছু কম সময় দাঁড়ায়। আর এই দুটি সময়কালকে একত্রিত করলে সেই বারো বছরই পাওয়া যায় যা আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি। আর যদি ইবনে সাআদের রেওয়ায়েত অনুসারে ধরে নেওয়া হয় যে হিজরতের পূর্বে রুখসাতানা হয়েছিল, তবুও বয়স দাঁড়ায় এগারো বছর, নয় বা দশ বছর নয়। আর এটা পুরোটাই গাণিতিক সমাধান যার বিপরীতে কোনও অনুমাণ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হল বিভিন্ন হাদীসে হযরত আয়েশা নিজে তাঁর বয়স ৯ বছর বলে উল্লেখ করেছেন? এর উত্তর হল, আমরা সেই সব রেওয়ায়েত বা হাদীসগুলিকে ভুল বলছি না, অর্থাৎ আমা মেনে নিচ্ছি যে, হযরত আয়েশার অনুমান ছিল যে রুখসাতানার সময় তাঁর বয়স নয় বছর ছিল। কিন্তু তাঁর মত অবশ্যই অনুমান ভিত্তিক ছিল, যেটি সঠিক ছিল না। আর এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুধাবন করতে পারে যে, বয়সের অনুমান করার সময় লোকের ভুল হওয়া সাধারণ বিষয়। কাজেই জন্মতারিখ এবং রুখসাতানার তারিখের ব্যবধান হিসেব করে হযরত আয়েশার বয়স যদি নয় বছর না হয়,তবে কেবল মাত্র হযরত আয়েশার এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে নয় বছর বয়সের রেওয়ায়েতটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তবে যদি কোনও সহী হাদীসে হযরত আয়েশার জন্ম তারিখ ৪র্থ নববীর প্রারম্ভকাল ছাড়া অন্য কিছু বর্ণনা করা হয়ে থাকে বা রুখসাতানার তারিখ ২য় হিজরী সনের শওয়াল মাস ছাড়া অন্য কোন তারিখ প্রমাণিত হয়, তবে নিশ্চয় এই রেওয়াতগুলি গ্রহণযোগ্য হবে । আর সেগুলির উপর ভিত্তি করেই বয়স নির্ধারণ করা হবে।

(ক্রমশ....)

জুমআর খুতবা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। মহম্মদ নবী (সা.)–এর পক্ষ থেকে মুসায়লামা কাযযাবের নামে। পরসমাচার এই যে, নিশ্চয় যমীন আল্লাহ্‌রই। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান উত্তরাধিকারী করবেন। আর পরকাল মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত এবং তার জন্য শান্তি হোক যে হিদায়তের অনুসরণ করে।

আঁ হযরত (সা.)–এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী খলীফায়ে রাশেদ সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)–এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত** ২০ ই মে , ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (২০ হিজরত, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)–র যুগে ইয়ামামার যুদ্ধের বিবরণ চলছিল। ইয়ামামার যুদ্ধের বিবরণে লেখা আছে যে, ইয়ামামা ইয়েমেনের একটি প্রসিদ্ধ শহর। বর্তমানে এই অঞ্চলটি সৌদি আরবে অবস্থিত।

(ফারহাঙ্গে সীরাত, প্রণেতা সৈয়্যদ ফজলুর রহমান, পৃ: ৩২১) (উর্দু দায়েরাহ মারেফুল ইসলামিয়া, খণ্ড–২৩, পৃ: ৩১১)

ইয়ামামা অত্যন্ত সবুজ–শ্যামল ও উর্বর এলাকা ছিল। অতএব ইয়ামামা সম্পর্কে লেখা আছে যে, ইয়ামামা সুন্দরতম শহরগুলোর মধ্যে একটি শহর ছিল আর এতে ধনসম্পদ, গাছপালা ও খেজুর প্রচুর পরিমাণে ছিল। (মুজামুল বুলদান, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫০৬)

ইয়ামামায় বনু হানীফা বসবাস করত, যারা চরম যুদ্ধবাজ জাতি ছিল। এদের সম্পর্কে তফসীরে কুরতবী'তে আয়াত سَتُدْعَوْنَ إِلٰى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ أَوْ يُسْلِمُوْنَ (সূরা আল্ ফাতাহ্ :১৭) অর্থাৎ, অচিরেই তোমাদেরকে একটি দুর্দান্ত যোদ্ধা জাতির প্রতি আহ্বান করা হবে, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়– এর তফসীরে লেখা রয়েছে যে; হাসান বলেন, যুদ্ধবাজ জাতি বলতে পারস্য ও রোমানদের বোঝায়। ইবনে যুবায়ের বলেন, এর দ্বারা হাওয়াযেন ও সাকীফের গোত্রগুলো বোঝায়। যুহরী ও মুকাতেল বলেন, এর দ্বারা বনু হানীফাকে বোঝায় যারা ইয়ামামা নিবাসী ও মুসায়লামার সঙ্গী ছিল। রাফে' বিন খাতীজ বলেন, আমরা উক্ত আয়াত পাঠ করতাম , কিন্তু আমরা জানতাম না যে, এই যুদ্ধবাজ জাতি কারা। এমনকি হযরত আবু বকর (রা.) যখন আমাদেরকে বনু হানীফার সাথে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন তখন আমরা বুঝতে পারি যে, এর দ্বারা এই জাতিকে বুঝায়।

(আল জামিয়ু লি আহকামুল কুরআন, প্রণেতা–আল্লামা কুরতাবী, পৃ: ২৮৫০–২৮৫১)

মহানবী (সা.) যখন সপ্তম হিজরীর সূচনায় অথবা কারো কারো মতে ষষ্ঠ হিজরীতে বিভিন্ন দেশের রাজা–বাদশাহ্‌র (কাছে) তবলীগি পত্র লিখেন, তখন ইয়ামামার বাদশাহ্ হওযা বিন আলী এবং ইয়ামামাবাসীদের উদ্দেশ্যেও একটি পত্র লিখেন, যাতে তাকে এবং ইয়ামামাবাসীদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন। নবম হিজরী সনে যখন বিভিন্ন প্রতিনিধিদল মদিনায় আসে তখন ইয়ামামা থেকে বনু হানীফার প্রতিনিধিদলও আসে। এ প্রতিনিধিদলে মুজাআ' বিন মুরারাও ছিল যাকে তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) একটি অনাবাদী জমি জায়গীর হিসেবে দান করেছিলেন। এই প্রতিনিধি দলে রাজ্জাল বিন উনফু য়াও ছিল। এছাড়া মুসায়লামা কায্যাব ও সু মামা বিন কাবীব বিন হাবীবও ছিল। ইবনে হিশামের মতে তার নাম ছিল মুসায়লামা বিন সুমামা, তার ডাকনাম ছিল আবু সুমামা। বনু হানীফার এই প্রতিনিধিদল মদিনায় এক আনসারী মহিলা রামলা বিন হারেস এর বাড়িতে অবস্থান করে।

(ফুতুহুল বুলদান লি ইমাম আবুল হাসান আহমদ বিন এহিয়া, পৃ: ৫৯)

যখন মহানবী (সা.)–এর হাতে বয়আ'ত করার জন্য ক্রমাগতভাবে প্রতিনিধিদল আসতে থাকে তখন মহানবী (সা.) মদিনায়একটি বাড়ি নির্ধারণ করেন যেখানে তারা অবস্থান করত। এই বাড়িটি ছিল রামলা বিনতে হারেসের, যিনি বনু নাজ্জারের একজন মহিলা ছিলেন। এটি অনেক বড় একটি বাড়ি ছিল।

(আল মুফাসসিলু ফি তারিখিল আরাব কাবলুল ইসলাম, প্রণেতা জওয়াদ আলি, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৮)

বনু হানীফার এই প্রতিনিধিদল যখন মহানবী (সা.)–এর সাথে সাক্ষাতের জন্য যায় তখন তারা মুসায়লামাকে নিজেদের সাথে নিয়ে যায় নি। তাকে তারা নিজেদের জিনিসপত্রের নিরাপত্তার জন্য পেছনে রেখে যায়। ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসায়লামার ব্যাপারে তারা মহানবী (সা.)–কে বলে যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আমাদের এক সঙ্গীকে আমাদের মালপত্র ও বাহনের কাছে রেখে এসেছি। সে আমাদের জন্য আমাদের মালপত্র পাহারা দিচ্ছে। তখন মহানবী (সা.) মুসায়লামার জন্যও সেই পরিমাণ উপহার প্রদানের নির্দেশ দেন যা অন্যদের দেওয়ার জন্য বলেছিলেন। তিনি আরও বলেন, সে মর্যাদায় তোমাদের চেয়ে তুচ্ছ নয়, কেননা সে তার সঙ্গীদের মালপত্রের নিরাপত্তা বিধান করছে। এরপর এই প্রতিনিধিদল মহানবী (সা.)–এর কাছ থেকে চলে যায় আর তিনি (সা.) মুসায়লামাকে যা দিয়েছিলেন তা–ও (সঙ্গে করে) নিয়ে যায়।

(আসসীরাতুন নবুয়ত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৮৫২)

বর্ণনাকৃত এই রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় যে, মুসায়লামা ছাড়া বনু হানীফার প্রতিনিধিদলের সকল সদস্যের সাথে মহানবী (সা.)–এর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। কিন্তু কোন কোন এমন রেওয়ায়েতও পাওয়া যায় যাতে মহানবী (সা.)–এর সাথে মুসায়লামার সাক্ষাতের উল্লেখ রয়েছে। সাধারণত এ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতই রয়েছে যে, মুসায়লামা সাক্ষাৎ করেছিল। এ সম্পর্কে এটিও বলা হয় যে, সম্ভবত সেযখন দ্বিতীয়বার এসেছিল তখন সাক্ষাৎ করেছিল। যাহোক, এর বিশদ বিবরণে আরও লেখা আছেযে, এই প্রতিনিধিদল যখন মহানবী (সা.)–এর সমীপে উপস্থিত হয় তখন মুসায়লামাও তাদের মাঝে ছিল, (যা অন্যত্র লেখা আছে)। তারা মুসায়লামাকে মহানবী (সা.)–এর সমীপে কাপড়ে আবৃত অবস্থায় নিয়ে আসে। মহানবী (সা.) সাহাবীদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন আর তাঁর হাতে খেজুরের একটি শাখা ছিল। মুসায়লামা তাঁর সাথে আলোচনা করে আর কিছু দাবিদাওয়া উপস্থাপন করে। তিনি (সা.) বলেন, তুমি যদি আমার কাছে আমার হাতে থাকা এই খেজুরের শাখাও চাও তাহলে তা–ও আমি তোমাকে দিব না।

(সুবালুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩২৬)

সহীহ্ বুখারীতে সংকলিত বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় যে, মুসায়লামা মহানবী (সা.)–এর সাথে সাক্ষাতের জন্য যায়নি; বরং মহানবী (সা.) স্বয়ং তার কাছে গিয়েছিলেন। অতএব উবায়দুল্লাহ্ বিন আবদুল্লাহ্ বিন উতবা বর্ণ না করেন, আমরা সংবাদ পাই যে, মুসায়লামা কায্যাব মদিনায় এসেছে এবং হারেসের মেয়ের বাড়িতে অবস্থান নিয়েছে। হারেস বিন কুরাইযের মেয়ে তার স্ত্রী ছিল আর সে ছিল আবদুল্লাহ্ বিন আমেরের মাতা। মহানবী (সা.) তার কাছে আসেন। মহানবী (সা.)–এর সাথে হযরত সাবেত বিন কায়েস বিন শিমাস (রা.) ছিলেন আর তাকে মহানবী (সা.)–এর খতীব বা লেখক বলা হতো।মহানবী (সা.)–এর হাতে ছিলএকটি লাঠি। তিনি (সা.) মুসায়লামার পাশে দাঁড়ান এবং তার সাথে কথা বলেন। মুসায়লামা তাঁকে (সা.) বলে, আপনি যদি চান তাহলে আমাদের এই বিষয়ের মাঝে আমাদেরকে ছেড়ে দিন। এরপর আপনি আপনার (তিরোধানের) পর

এটিকে আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন। অর্থাৎ, নবুওয়্যতের বিষয়ের সিদ্ধান্ত, আপনার পর যেন আমি লাভ করি। এটিই তার সবচেয়ে বড় দাবি ছিল। (উত্তরে) মহানবী (সা.) বলেন, যদি তুমি আমার কাছে এই লাঠিটিও চাও তাহলে আমি তোমাকে তা দিব না। আর আমি তোমাকে সেই ব্যক্তিই মনে করি যার সম্পর্কে আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে, যা আমাকে দেখানো হয়েছে। আর এ হলো, সাবেত বিন কায়েস; তিনি আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উত্তর দিবেন। এরপর মহানবী (সা.) ফিরে যান।

(সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নম্বর-৪৩৭৮)

অনুরূপভাবে অন্য এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে মুসায়লামা কাযযাব আসে আর বলে, যদি মুহাম্মদ (সা.) তাঁর পরে আমাকে (তাঁর) স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন তাহলে আমি তাঁর অনুসরণ করব। এর মাধ্যমে প্রথম রেওয়ায়েতটি আরও স্পষ্ট হয়। আর সে সেখানে নিজ গোত্রের অনেক মানুষের সাথেএসেছিল। মহানবী (সা.) তার কাছে আসেন আর তাঁর (সা.) সাথে হযরত কায়েস বিন সাবেত বিন শিমাস ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর হাতে খেজুর গাছের একটি লাঠি ছিল। এমনকি তিনি (সা.) এসে মুসায়লামার সামনে দাঁড়ান যখন সে তার সঙ্গীদের মাঝে ছিল। তিনি (সা.) বলেন, তুমি যদি আমার কাছে এই লাঠিটিও চাও তাহলে আমি এটিও তোমাকে দিব না। আর তুমিকখনো নিজের বিষয়ে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করতে পারবে না। তুমিযদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে আল্লাহ্ তোমার মূল কর্তন করে দিবেন। আর আমি দেখছি যে, তুমি সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে আমাকে স্বপ্নে অনেক কিছু দেখানো হয়েছে। আর ইনি হলেন, সাবেত বিন কায়েস; যিনি আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উত্তর দিবেন। এরপর তিনি (সা.) তাকে ছেড়ে ফিরে যান। এটিও বুখারীর রেওয়ায়েত।

(সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নম্বর-৪৩৭৩)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর এই কথা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আমার মনে হচ্ছে তুমি সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে আমাকে স্বপ্নে সেসব কিছু দেখানো হয়েছে যা দেখানো হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) আমাকে বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, একবার আমি ঘুমন্ত ছিলাম, এমন সময় আমি আমার হাতে দুটি স্বর্ণের কঙ্কণদেখতে পাই। (এখানে স্বপ্নের উল্লেখ হচ্ছে।) এগুলোর অবস্থা আমাকে চিন্তায় ফেলে দেয়। [মহনবী (সা.) বলেন, হাতে কঙ্কণদেখেছি, এ অবস্থা আমাকে চিন্তায় ফেলে দেয়।] এরপর আমাকে স্বপ্নের মাঝেই ওহী করা হয় যেন আমি এগুলোতে ফুঁ দিই। অতএব আমি সেগুলোতে ফুঁ দিলে সেগুলো উধাও হয়ে যায়। আমি এর ব্যাখ্যা হিসেবে দুজন মিথ্যাবাদী ব্যক্তিকে মনে করি যারা আমার পরে আত্মপ্রকাশ করবে। বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ্ বলেন, এদের একজন হলো সেই আন্‌সী যাকে ফিরোজ ইয়েমেনে হত্যা করেছে আর দ্বিতীয়জন হলো মুসায়লামা কায্‌যাব। এটিও বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত।

(সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নম্বর-৪৩৭৪)

(সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নম্বর-৪৩৭৯)

যাহোক, উপরোক্ত রেওয়ায়েতগুলো থেকে এটিই মনে হয় যে, মুসায়লামা কায্‌যাব একাধিকবার মদিনায় এসেছিল। একবার সেই সময় যখন তার দলের লোকেরা তাকে জিনিসপত্রের দেখাশোনার জন্য পিছনে রেখে গিয়েছিল, আর মহানবী (সা.)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয় নি। আর দ্বিতীয়বার সে তখন মদিনায় এসেছিল যখন তার সাক্ষাৎ মহানবী (সা.)-এর সাথে হয়েছিল আর যাতে সে মহানবী (সা.)-এর কাছে স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দাবি করেছিল। এ প্রসঙ্গে সহীহ্ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাত্‌হুল বারী পুস্তকে লিখা আছে যে, সম্ভবত মুসায়লামা দুইবার মদিনায় এসে থাকবে। প্রথবার সেই সময় যখন বনু হানীফার নেতা তার পরিবর্তে অন্য কেউ ছিল (অর্থাৎ, তখন সে নিজ গোত্রের নেতা ছিল না, বরং) অন্য কেউ ছিল আর সে তার অধীনস্থ ছিল। এজন্যই তাকে জিনিসপত্রের দেখাশোনার জন্য পিছনে রাখা হয়েছিল। আর দ্বিতীয়বার সে তখন আসে যখন লোকেরা তার অধীনস্থ ছিল আর তখনই মহানবী (সা.)-এর সাথে তার কথা হয়েছিল। অথবা এটিও হতে পারে যে, ঘটনা একটি-ই ছিল আর সে স্বেচ্ছায় তার আত্মসম্ভ্রমবোধ এবং এ বিষয়ে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার পরিবর্তে জিনিসপত্রের কাছে থেকে যায়। কিন্তু মহানবী (সা.) (মানুষের)মনস্তুষ্টির স্বভাবের কারণে তার সাথে সম্মানপূর্ণ আচরণ করেন। এছাড়া হাদীসে এটিও উল্লেখ রয়েছে যে, সে এক বড় দলের সাথে এসেছিল। বলা হয়ে থাকে যে, সেসতেরোজন লোকের সাথে এসেছিল। এ বিষয়টিও মুসায়লামার একাধিকবার মদিনায় আসার প্রমাণ বহন করে।

(ফাতহুল বারী, শারাহ সহীহুল বুখারী, লি ইবনে হিজার, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১১২, হাদীস-৪৩৭৩)

যাহোক, এ দলটি ইয়ামামায় ফিরে যাওয়ার পর আল্লাহ্‌র শত্রু মুসায়লামা মুরতাদ হয়ে যায় এবং নবী হওয়ার দাবি করে বসে। আর বলে, মহানবী (সা.)-এর সাথে আমাকেও নবুয়্যতের অংশীদার বানানো হয়েছে।

তোমরা যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে আমার কথা উল্লেখ করেছিলে তখন কি তিনি একথা বলেন নি যে, সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে সে তোমাদের চেয়ে তুচ্ছ নয়। মহানবী (সা.) একথা কেবল এজন্য বলেছিলেন কেননা তিনি জানতেন যে, তিনি (সা.) নবীআর আমাকেও তাঁর বিষয়ে অংশীদার করা হয়েছে। এরপর মুসায়লামা মনগড়া বাণী রচনা করতেথাকে এবং মানুষের জন্য পবিত্র কুরআনের নকল করে বাণী রচনা করতে থাকে আর তাদের জন্য নামায মাফ করে দেয়। সে নিজস্ব শরীয়ত চালু করে আর নামায মাফ করে দেয়। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে সে দুই বেলার নামায তথা এশা ও ফজরের নামায মাফ করে দিয়েছিল এবংমানুষের জন্য মদ্যপান ও ব্যভিচারকে বৈধ ঘোষণা করেছিল। একইসাথে সে এ সাক্ষ্যও দিত যে, মহানবী (সা.) নবী। ফলে বনু হানীফা এসব বিষয়ে তার সাথে একমত পোষণ করে।

(সুবালুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩২৬))(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, প্রকাশকাল-১৯৮৭)

মুসায়লামার শক্তি বৃদ্ধির আরেকটি কারণ ছিল রাজ্জাল বিন উনফুয়ার তার সাথে যুক্ত হওয়া। অত্যন্ত চতুরতার সাথে প্রথমত সে শরীয়তের মধ্যে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে দিয়ে বলে যে, শরীয়তে এই এই সুযোগ-সুবিধা রয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতিও ওহী অবতীর্ণ করেছেন। আর একই সাথে সে একথাও স্বীকার করত যে, মহানবী (সা.) নবী, যেন যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তাদের মাঝে এমন কোন ধারণা সৃষ্টি না হয় যে, সে আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত কপটতার সাথে সে এসব কাজ করেছে। যাহোক, তিনি লিখেন, মুসায়লামার শক্তি বৃদ্ধির আরেকটি কারণ ছিল রাজ্জাল বিন উনফু য়ার তার সাথে যুক্ত হওয়া। এ ব্যক্তিও ইয়ামামার-ই অধিবাসী ছিল এবং বনু হানীফার প্রতিনিধি দলের সাথেও এসেছিল। সে হিজরত করে মদিনায় মহানবী (সা.)-এর কাছে চলে এসেছিল। এখানে সে পবিত্র কুরআন পাঠ করে এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে।

মুসায়লামা যখন মুরতাদ হয়ে যায় তখন মহানবী (সা.) তাকে ইয়ামামাবাসীদের কাছে শিক্ষকরূপে প্রেরণ করেন এবং মানুষকে মুসায়লামার আনুগত্য করা থেকে বিরত রাখতে পাঠান। কিন্তু সে মুসায়লামার চাইতে বড় ফিতনার কারণ হয়।

সে যখন দেখে যে, মানুষ মুসায়লামার আনুগত্য গ্রহণ করে চলেছে তখন সে ঐসব লোকের দৃষ্টিতে নিজেকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। তাকে পাঠানো হয়েছিল সেখানকার লোকদের সংশোধনের জন্য এবং নৈরাজ্য দূরীকরণের জন্য, কিন্তু সে মুসায়লামার সাথে যোগ দেয়। উপরন্তু সে মুসায়লামার মিথ্যা নবুয়্যতের স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি একটি মিথ্যা বক্তব্যও আরোপ করে যে, মুসায়লামাকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে নবুয়্যতেরঅংশীদার করা হয়েছে- একথাও সে প্রচার করে। যেহেতু সে কুরআন করীমের জ্ঞান অর্জন করেছিল তাই লোকেরা তার কথায় বিশ্বাস করে। ইয়ামামাবাসীরা যখন দেখে যে, এমন এক ব্যক্তি মুসায়লামার নবুয়্যতের সাক্ষ্য দিচ্ছে যে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গীদের একজন এবং সে মানুষকে কুরআন করীমের শিক্ষা দেয় তখন তাদের জন্য মুসায়লামার নবুয়্যত অস্বীকার করার আর কোন অবকাশ রইল না। ফলে মানুষ দলে দলে মুসায়লামার কাছে এসে তার বয়আত করতে আরম্ভ করে।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ১৮৭-১৮৮) (তারিখ ইবনে খালদুন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৭-৪৩৮)

মুসায়লামা রসূ লুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে একটি পত্রও লিখে যার মূল বিষয় ছিল এরূপ যে, আল্লাহ্‌র রসূল মুসায়লামার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি। পরসমাচার, অর্ধেক জমি আমাদের এবং অর্ধেক কুরায়েশদের। কিন্তু কুরায়েশরা ন্যায়বিচার করে না।

এর উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে পত্র লিখেন যে, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। (আল্লাহ্‌র) নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে মুসায়লামা কায্‌যাবের প্রতি। পরসমাচার, নিশ্চয় (সব) জমি আল্লাহ্‌রই। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে চাইবেন এর উত্তরাধিকারী বানাবেন এবং শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত। তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক যে হেদায়াতের অনুসরণ করে। (ফুতুহুল বুলদান লি ইমাম আবুল হাসান আহমদ বিন এহিয়া, পৃ: ৫৯-৬০)

একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত হাবীব বিন যায়েদ আনসারী (রা.) মহানবী (সা.)-এর পত্র নিয়ে মুসায়লামার কাছে

গিয়েছিলেন। তিনি যখন উক্ত পত্রমুসায়লামার কাছে দেন তখন সে বলে, তুমি কি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল? তিনি (রা.) বলেন, হ্যাঁ। এরপর সে বলে, তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্‌র রসূল? তখন তিনি (রা.) বলেন, আমি বধির, শুনতে পাই না। অর্থাৎ,তিনি কথা ঘুরিয়ে দেন। মুসায়লামা বার বার এ প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি করতে থাকে আর তিনিও একই উত্তর দিতে থাকেন। আর প্রতিবারই হযরত হাবীব (রা.) যখন তার প্রত্যাশা অনুযায়ী উত্তর না দিতেন (সে চাচ্ছিল তিনি যেন তাকেও নবী বলে স্বীকার করেন), যখন তার প্রত্যাশা অনুযায়ী উত্তর না পেত তখন সে উনার কোন একটি অঙ্গ কেটে ফেলত। (নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে কোন না কোন অঙ্গ কেটে ফেলত যে, এখন ইতিবাচক উত্তর দাও।) কিন্তু হযরত হাবীব (রা.) ধৈর্য্য ও অবিচলতায় পাহাড়ের ন্যায় অনড় থাকেন। এভাবে সে উনাকে টুকরো টুকরো করে দেয় আর তার সামনেই হযরত হাবীব (রা.) শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসীয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা- সালাবী, পৃ: ৩৪৯)

মুসায়লামা ইয়ামামাতে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে।

এখন এটি শুধু নবুয়্যতের দাবি নয়, বরং নিপীড়ন ও নির্যাতনও বটে, যেভাবে সে তাকে নবী মানতে অস্বীকারকারীদের সাথে আচরণ করেছে।মুসায়লামা ইয়ামামাতে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে এবং ইয়ামামা থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর গভর্ণর হযরত সামামা বিন উসাল (রা.)-কে বের করে দেয়।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক আকবর, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল- অনুবাদক- শেখ মহম্মদ আহমদ পানিপতী, পৃ: ১০১) (তারিখুল খামিস, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৮১)

মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রা.) যখন মুরতাদদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সেনাদল প্রেরণ করেন তখন হযরত ইকরামা (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসায়লামার উদ্দেশ্যেও তিনি একটি সেনাদল প্রেরণ করেন এবং তাকে সাহায্য করার জন্য তার পিছনে হযরত শুরাহ্ বীল বিন হাসান (রা.)কে প্রেরণ করেন।হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইকরামা (রা.)-কে এই নির্দেশনা প্রদান করেন যে, শুরাহ্‌বীল পৌঁছার পূর্বে মুসায়লামার সাথে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়ো না। কিন্তু হযরত ইকরামা ত্বরাপরায়ণতার পরিচয় দেন এবং হযরত শুরাহ্‌বীল পৌঁছার পূর্বেই ইয়ামামাবাসীর ওপর আক্রমণ করে বসেন যেন বিজয়মুকুট তার মাথায় শোভা পায়, কিন্তু তিনি বিপদে পরিবেষ্টিত হন এবং পরাজয়ের সম্মু খীন হতে হয়। মুসায়লামার বাহিনী অনেক বড় ছিল। হযরত শুরাহ্ বীল যখন উক্ত ঘটনা জানতে পারেন তখন তিনি পথিমধ্যেই থেমে যান। হযরত ইকরামা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে পাঠান তখন হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে তাকে লিখেন, আমি তোমার চেহারাও দেখব না আর তুমিও আমাকে দেখবে না, আমি যে নির্দেশনা দিয়েছিলাম তুমি তা অমান্য করেছ। তুমি এখানে ফিরে এসো না, কেননা এতে মানুষের মাঝে কাপুরুষতা সৃষ্টি হতে পারে। তুমি হুযাফা ও আরফাজার কাছে চলে যাও এবং তাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে ওমান ও মাহরাবাসীদের সাথে যুদ্ধ কর। মাহরা আরবের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত একটি অঞ্চলের নাম। তিনি আরও বলেন, এরপর তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে ইয়েমেন ও হাযার মওতে চলে যেও। সেখানে গিয়ে ইসলামী সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দিবে। হাযার মওতও ইয়েমেনের পূর্বে অবস্থিত একটি রাজ্য, যার দক্ষিণ সীমান্ত সমুদ্র বেষ্টিত।

অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পত্রের যে বাক্যাবলী পাওয়া যায় তাহলো, নেতৃত্ব দিতে জান না আবার শিষ্যত্বগ্রহণেও অনিচ্ছুক। এতটুকুও তুমি ভালোভাবে জান না। যুদ্ধের যেসব কৌশল ও পন্থা থাকে সেক্ষেত্রে যতটুকু সুদক্ষ হওয়া উচিত ততটুকু তুমি নও আর শিখতেও তোমার অনীহা। তুমি যেদিন আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন দেখবে আমি তোমার সাথে কী ব্যবহার করি। তুমি শুরাহ্ বীলের আগমন পর্যন্ত কেন অপেক্ষা করে তার সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমে যুদ্ধ কর নি। এখন হুযায়ফার কাছে যাও এবং তাকে সাহায্য কর।

তুমি যুগখলীফার নির্দেশ অমান্য করেছ এবং নিজেকে বড় উস্তাদ মনে কর আর শিখতে চাও না। এখন নির্দেশনা এটাই যে, তুমি আমার কাছে আসবে না। তোমার সাথে সাক্ষাৎ হলে ভেবে দেখব তোমার সাথে কী আচরণ করা যায়। কিন্তু যাহোক, এখন তোমার জন্য নির্দেশ এটাই যে, তুমি হুযায়ফার কাছে গিয়ে তার সাহায্য কর, তার সাথে যুক্ত হয়ে তাকে যে অভিযান সম্পন্ন করার জন্য পাঠানো হয়েছে সেক্ষেত্রে তার সহযোগিতা কর। তার যদি তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন না পড়ে তাহলে তুমি ইয়েমেন এবং হাযার মওতে চলে যেও এবং সেখানে মুহাজের বিন উমাইয়্যার সাহায্য কোরো। হযরত আবু বকর (রা.) মুহাজের বিন উমাইয়্যাকে কিন্দা গোত্রের মুকাবিলা করার জন্য হাযার মওত পাঠিয়েছিলেন।

(সীরাত খলীফাতির রসুল সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- তালিবুল হাশমি, পৃ: ২০৪) (উর্দু দায়েরাহ মারেফে ইসলামিয়া, খণ্ড-২১, পৃ: ৮৯৮) (উর্দু দায়েরাহ মারেফে ইসলামিয়া, খণ্ড-৮, পৃ: ৪০৮) (হযরত আবু বাকার কে সরকারী খাতুত, পৃ: ২৪) (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড,পৃ: ২৫৭) (আল কামিলু ফিত তারিখ লি ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১৮-২১৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০০৬)

হযরত আবু বকর (রা.) হযরত শুরাহ্ বীলকে পরবর্তী নির্দেশনা পাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করার নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে ইয়ামামায় পাঠানোর পূর্বে হযরত শুরাহ্ বীলকে লিখে পাঠান যে,

খালেদ যখন তোমার কাছে আসবেন এবং ইয়ামামায় তোমার কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে তখন তুমি কুযাআ অভিমুখে যাত্রা করবে এবং হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর সাথে যুক্ত হয়ে কুযাআর সেসব বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করবে যারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে এবং ইসলামের বিরোধিতায় বদ্ধ পরিকর থাকবে।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড,পৃ: ২৫৭)

শুধু অস্বীকারই নয় বরং বিরোধিতাও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হযরত শুরাহ্ বীলও হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশনার বিপরীতে হযরত ইকরামার মতো ত্বরাপরায়ণতার পরিচয় দিয়ে তার কাছে হযরত খালেদ (রা.)-এর আগমনের পূর্বেই মুসায়লামার সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে দেন, কিন্তু তিনিও পরাজয়ের সম্মু খীন হন। এতে হযরত খালেদ (রা.) তার প্রতি অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদ (রা.)-এর সাহায্যের জন্য হযরত সালীদের নেতৃত্বে অতিরিক্ত সাহায্যকারী বাহিনীও প্রেরণ করেন যেন তারা সেনাবাহিনীর পশ্চাৎভাগকে সুরক্ষিত রাখতে পারেন।

(আল কামিলু ফিত তারিখ লি ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১৮-২১৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০০৬)

হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদ (রা.)-কে মুসায়লামার দিকে প্রেরণ করেন এবং তার সাথে যুক্ত হয়ে যুদ্ধ করার জন্য মুহাজের ও আনসারদের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত সাবেত বিন কায়েসকে আনসারদের আমীর এবং হযরত আবু হুযায়ফা ও যায়েদ বিন খিতাবকে মুহাজেরদের আমীর নিযুক্ত করেন। অনুরূপভাবে যত গোত্র ছিল প্রত্যেক গোত্রের জন্য একেকজনকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। হযরত খালেদ বুতাহ্ নামক স্থানে এই বাহিনীর আগমনের অপেক্ষা করছিলেন। বুতাহ্ হলো, বনী যয়ীম গোত্রের একটি জায়গা। যাহোক এরা সবাই যখন হযরত খালেদের কাছে পৌঁছে যায় তখন তিনি ইয়ামামার উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করেন। বনু হানীফার লোকসংখ্যা সেদিন অনেক বেশি ছিল। তাদের বাহিনী ছিলচল্লিশ হাজার যোদ্ধা সম্বলিত। ইয়ামামার এই দল, যারা মুসায়লামার সাথে ছিল, তাদের সংখ্যা চল্লিশ হাজার ছিল। অপর একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের সংখ্যা এক লক্ষ বা তারও অধিক ছিল। এর বিপরীতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল দশ হাজারের কিছু বেশি।

(আল বাদাইয়াতু ওয়ান নিহাইয়াহ, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃ: ২৬৭) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ৫৮)

যাহোক, সেখানে যখন বড়সড় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই মুসলমানরা বনু হানীফার এক নেতাকে গ্রেফতার করে ফেলে। যেমন এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মুজাআ বিন মুরারা, যে বনু হানীফা গোত্রের অন্যতম নেতা ছিল, সে যখন একটি দলের সাথে বাইরে বের হয় তখন মুসলামানরা তার সঙ্গীসাথিসহ তাকে আটক করে ফেলে। হযরত খালেদ তার সঙ্গীদের হত্যা করেন এবং মুজাআ-কে জীবিত রাখেন, কেননা বনু হানীফা গোত্রে তার অনেক সম্মান ছিল।

(আল কামিলু ফিত তারিখ লি ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১৯-২২০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০০৬)

এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো, হযরত খালেদ যখন আরিয নামক স্থানে পৌঁছেন তখন দুই শত অশ্বারোহী অগ্রে প্রেরণ করেন এবং বলেন যাদেরকেই পাও বন্দি করবে। সেই অশ্বারোহীদের দল যাত্রা করে, এমনকি তারা মুজাআ বিন মুরারা হানাফীকে তার তেইশ জন সমগোত্রীয় লোকের সাথে বন্দি করে ফেলে, যারা বনু নুমায়ের গোত্রের এক ব্যক্তির সন্ধানে বেরিয়েছিল। তারা বাইরে বেরিয়েছিল এবং হযরত খালেদের আগমনের কথা তারা জানত না। মুসলমানরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কারা? তারা উত্তরে বলে, আমরা বনু হানীফা গোত্রের সদস্য।

মুসলমানরা মনে করে তারা হযরত খালেদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত মুসায়লামার গুপ্তচর। সকারে যখন লোকেরা মুখোমুখি হয় তখন মুসলমানরা তাদের ধরে এনে হযরত খালেদের নিকট উপস্থিত করে। হযরত খালেদ নিজেও তাদেরকে দেখে মনে করেন, এরা হয়ত মু সায়লামার গুপ্তচর। তিনি (রা.) তাদের জিজ্ঞেস করেন, হে বনু হানীফাবাসী! তোমাদের নেতা অর্থাৎ মুসায়লামার বিষয়ে তোমাদের কী অভিমত? তারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে আল্লাহ্‌র রসূল। হযরত খালেদ মুজাআ-কে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কী অভিমত? সে বলে, খোদার কসম! আমি কেবলমাত্র বনু নুমায়ের গোত্রের এক সদস্যের সন্ধানে বেরিয়েছিলাম যে-কিনা আমাদের গোত্রে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে আর আমি মুসায়লামার নৈকট্যভাজন কেউ নই। যাহোক, সেই মুহূর্তে সে প্রাণভয়ে হোক আর যেকারণেই হোক না কেন, নিজের কথা থেকে ঘুরে যায় আর বে লে আমি রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম এবং এখনও আমি মুসলমানই আছি। (তার গোত্রের) অন্যদেরও নিয়ে আসা হয় এবং হযরত খালেদ তাদের সবার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। অবশেষে যখন সারিয়া বিন মুসায়লামা বিন আমেরের পালা আসে, সে বলে, হে খালেদ! তুমি যদি ইয়ামামাবাসীদের কোন ভালো বা মন্দ চাও তাহলে মুজাআ-কে জীবিত রাখ। সে যুদ্ধ ও শান্তি উভয় অবস্থাতে তোমার সাহায্যকারী হবে এবং সে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিল। এজন্য তিনি (রা.) তাকে হত্যা করান নি। সারিয়ার এ কথা তার (রা.) পছন্দ হয়। তাই তিনি তাকেও জীবিত রাখেন এবং তাদের দুজনকে লোহার শিকল দিয়ে বাঁধার আদেশ দেন। তিনি মুজাআ-এর লোহার শিকলে শিকলাবদ্ধ অবস্থাতেই তাকে ডেকে কথা বলতেন। মুজাআ মনে করত তাকে হযরত খালেদ হত্যা করবেন। তাদের কথোপকথনের মাঝে মুজাআ বলে বসে, হে ইবনে মুগীরাহ্‌! (এটি খালেদ বিন ওয়ালীদের ডাক নাম ছিল), আমি মুসলমান। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কোন কুফরী করি নি, আমি রসূলে করীম (সা.) -এর সকাশে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট থেকে ইসলাম গ্রহণ করে বেরিয়ে ছিলাম আর এখনও আমি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হই নি। এরপর সে নুমায়েরার সন্ধান করার কথা পুনরাবৃত্তি করে। হযরত খালেদ বলেন, হত্যা করা আর মুক্ত করে দেয়ার মাঝে কিছুটা দূরত্ব আছে। অর্থাৎ বন্দি করে রাখা, যতদিন না আল্লাহ্‌ আমাদের যুদ্ধের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। আর তিনি তা অচিরেই করবেন। তিনি (রা.) তার স্ত্রীর অধীনে তাকে হস্তান্তর করেন যাকে তিনি (রা.) মালেক বিন নুয়ায়রা'র হত্যার পর বিয়ে করেছিলেন। তিনি (রা.) তার স্ত্রীকে আদেশ দেন যেন বন্দি অবস্থায় তার প্রতি ভালোভাবে খেয়াল রাখা হয়। মুজাআ মনে করে, খালেদ তার কাছ থেকে শত্রুদের অবস্থান জানার জন্য বন্দি করে রেখেছেন। সে বলে, আপনি জানেন আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম এবং তাঁর হাতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলাম? সে বারংবার এ কথারই পুনরাবৃত্তি করছিল।এরপর আমি নিজ জাতিতে ফিরে যাই এবং আজও আমার অবস্থা তা-ই আছে যা গতকাল ছিল। কিন্তু পরবতীতে যেসব ঘটনাবলী সংঘটিত হয়, সেগুলো থেকে বুঝা যায় যে, এগুলো তার মিথ্যাচার ছিল।

(আল ইকতিফা বিমা তাযমিনা মিন মাগাযী, ২য় ভাগ, পৃ: ১১৯-১২০)

মুজাআ-র দলের বিষয়টি নিষ্পত্তি করে হযরত খালেদ ইয়ামামা অভিমুখে অগ্রসর হন।

তার আগমনের সংবাদ পেয়ে মুসায়লামা নিজ গোত্র বনু হানীফাকে নিয়ে মোকাবিলার জন্য বের হয় এবং আকরাবায় গিয়ে শিবির স্থাপন করে। এই স্থানটিও ইয়ামামার সীমান্তে ইয়ামামার ক্ষেত-খামার ও সবুজ-শ্যামল এলাকার সামনে অবস্থিত ছিল। খালেদ (রা.) নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনার উদ্যোগ নেন। তিনি শত্রুকে কখনো দুর্ব ল মনে করতেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বদা পূর্ণ প্রস্তুতি ও পরিপূর্ণ সতর্কতার সাথে থাকতেন, যেন পাছে শত্রু অকস্মাৎ আক্রমণ না করে বসে বা কোন ষড়যন্ত্র না করতে পারে। তার সম্পর্কে এই বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নিজে ঘুমোতেন না, কিন্তু অন্যদের ঘুমোনোর সুযোগ দিতেন; নিজে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাত পার করতেন। শত্রুপক্ষের কোন বিষয়ই তার কাছে গোপন থাকত না। সৈন্যদল সুবিন্যস্ত করার সময় ঘনিয়ে এসেছিল। এই যুদ্ধে পতাকাবাহক ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন হাফস বিন গানেম, এরপর তা হযরত আবু হুযায়ফার মুক্তকৃত ক্রীতদাস হযরত সালেমের হাতে অর্পিত হয়। হযরত খালেদ এই যুদ্ধে হযরত শুরাহ্‌ বীল বিন হাসানাকে অগ্রে প্রেরণ করেন আর মুসলিম সৈন্যদলকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। সম্মুখভাগে হযরত খালেদ মাখযূমী, ডানদিকে হযরত আবু হুযায়ফা, বামদিকে হযরত শুজাআ', মধ্যভাগে হযরত উসায়েদ বিন খাত্তাব এবং অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে হযরত উসামা বিন যায়েদকে নিযুক্ত করেন। আর উটগুলোকে তিনি বাহিনীর পেছনে রাখেন, যেগুলোর ওপর তাঁবু চাপানো ছিল এবং মহিলারা তাতে আরোহিত ছিল। এই বিন্যাস ছিল যুদ্ধের পূর্বের সর্বশেষ বিন্যাস।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক শখসীয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা-ডক্টর-আলি মহম্মদ আস সালাবী, পৃ: ৩৫৭-৩৫৮)

অন্যদিকে মুসায়লামা কায্‌ যাবের বাহিনীও প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং মুসায়লামার পুত্র শুরাহ্‌ বীল নিজ গোত্রের উদ্দেশ্যে বলে, হে বনু হানীফা! আজ আত্মাভিমান প্রদর্শনের দিন! আজ যদি তোমরা পরাজিত হও তাহলে তোমাদের নারীদের দাসী বানানো হবে এবং বিবাহ ছাড়াই তাদেরকে ব্যবহার করা হবে। তাই আজ তোমরা নিজেদের সম্মান-সম্ভ্রমের সুরক্ষায় পূর্ণ বীরত্ব প্রদর্শন কর এবং নিজেদের নারীদের সুরক্ষা বিধান কর।

(তারিখুত তাবারী, লি আবি জাফর মুহাম্মদ বিন আত তাবারী, ২য় খণ্ড,পৃ:২৭৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০১২)

যাহোক, এরপর তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ এত কঠিন ছিল যে, মুসলমানদের এর পূর্বে কখনো এরূপ যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয় নি। মুসলমানরা পিছু হটতে বাধ্য হয়; (এখানেও পিছু হটতে হয়েছিল) এবং বনু হানীফার লোকেরা মুজাআ'কে মুক্ত করার জন্য অগ্রসর হয় ও হযরত খালেদের তাঁবু তে হামলার সংকল্প করে। হযরত খালেদ ততক্ষণে তাঁবু হতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তাই তারা মুজাআ' পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যে কিনা হযরত খালেদের স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে ছিল। মুরতাদরা তার স্ত্রীকে হত্যা করতে চায়, কিন্তু মুজাআ' তাদের বাধা দেয় এবং বলে, একে আমি নিরাপত্তা দিচ্ছি। তাই তারা তাকে ছেড়ে দেয়। মুজাআ' বলে, তোমরা পুরুষদের ওপর আক্রমণ কর। (একদিকে সে এই দাবি করত যে, আমি মুসলমান; অপরদিকে বিরুদ্ধবাদীদের বলছে, তামরা পুরুষদের ওপর আক্রমণ কর।) এরপর তারা তাঁবু কেটে ফেলে।

(আল কামিলু ফিত তারিখ লি ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০০৬)

মুসলিম বাহিনী পিছু হটলেও হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদের দৃঢ়সংকল্প, অবিচলতা, সাহস ও দৃঢ়চিত্ততায় বিন্দুমাত্রও ভাটা পড়ে নি এবং এক মুহূর্তের জন্যও তিনি মনে করেন নি যে ,পরাজিত হবেন। হযরত খালেদ উচ্চস্বরে নিজ বাহিনীকে ডেকে বলেন, হে মুসলমানেরা! পৃথক পৃথক হয়ে যাও; (অর্থাৎ প্রত্যেক গোত্র যেন আলাদা আলাদাভাবে জোটবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে) এবং এই অবস্থাতেই শত্রুর সাথে লড়াই কর যেন আমরা দেখতে পাই যে, কোন্‌ গোত্র যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বীরত্ব প্রদর্শন করেছে। এই ঘোষণার অর্থ ছিল, প্রত্যেক মুসলমান যেন স্ব-স্ব গোত্রের পতাকাতলে যুদ্ধ করে। এর মাধ্যমে তিনি সকল গোত্রের মাঝে যেন এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন এবং তাদের মাঝে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও বীরত্ব প্রমাণ করার জন্য এক প্রতিযোগিতার স্পৃহা সৃষ্টি করেন।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ১৯৫-১৯৬)

মুসলমানরাও একে অপরকে অনুপ্রাণিত করে। এর বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে জানা যায় যে, হযরত সাবেত বিন কায়েস বলেন, হে মুসলানেরা! কতই না মন্দ সেই বিষয় যাতে তোমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ! (অর্থাৎ, যদি আরামপ্রিয়তায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে থাক তবে তা খুবই মন্দ কথা।) সাহাবীরা একে অপরকে যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করতে থাকে এবং বলতে থাকে, হে সূরা বাকারার অধিকারীরা, আজ মায়াজাল কেটে গেছে। হযরত সাবেত বিন কায়েস হাঁটু সমান মাটিতে গর্ত করে নিজেকে তাতে প্রথিত করেন। তিনি আনসারদের পতাকা বহন করছিলেন। এছাড়া তিনি 'হনুত' মেখে নিয়েছিলেন। আরবে এই রীতি ছিল যে, যারা নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শন করতে চাইতো তারা এমন করতো, তারা এটি প্রকাশ করতে চাইতো যে, মৃত্যুর পর মানুষের আমার সাথে যা করার কথা ছিল তা আমি নিজেই নিজের সাথে করে নিয়েছি। নিজেকে অর্ধেক মাটিতে পুঁতে নিয়েছি; অর্থাৎ আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। আর 'হনুত' ছিল কয়েকটি সুগন্ধীযুক্ত জিনিসের এক মিশ্রণ, যা লাশকে গোসল করানোর পর তার শরীরে লাগানো হয়। অথবা সেসব ঔষধ যা শবদেহে লাগালে দীর্ঘ সময়তা পঁচন থেকে সুরক্ষিত থাকে। যাহোক, রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কাফন বেঁধে নেন আর শত্রুদের মোকাবিলায় অবিচল থাকেন। অবশেষে তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

(আল বাদাইয়াতু ওয়ান নাহাইয়াহ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃ: ৩২০)(ফিরোযুল লুগাত, উর্দু, পৃ: ৬০৯)

এর বিবরণ আরও বাকি আছে, যা ইনশাআল্লাহ্‌ আগামীতে উপস্থাপন করা হবে।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই। সর্বপ্রথম এক শহীদের স্মৃতিচারণ করা হবে যাকে কয়েকদিন পূর্বে শহীদ

করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন উকাড়ার এল-প্লট জামা'তের প্রেসিডেন্ট মাস্টার মুনাওয়ার আহমদ সাহেবের পুত্র জনাব আব্দুস সালাম সাহেব। তাকে ১৭ মে তারিখে শহীদ করা হয়েছে। তার বয়স ছিল ৩৫ বছর। আহমদী বিরোধী এক ব্যক্তি ছুরিকাঘাতে তাকে শহীদ করেছে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ অনুসারে আব্দুস সালাম সাহেব নিজের দুই শিশু সন্তান স্নেহের ক্বমর ইসলাম যার বয়স ছয় বছর ও স্নেহের বদর ইসলাম যার বয়স সাড়ে চার বছর, তাদে রকে সাথে নিয়ে কোন কাজে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন, বরং তাকে ডাকা হয়েছিল যে, তোমাদের ঘরের পানির সংযোগ ঠিক করিয়ে নাও। আর মনে হচ্ছে এটিও তাদের কোন পরিকল্পনা ছিল। পূর্বপরিকল্পিতভাবে তাকে বাড়ি থেকে বাহিরে ডেকে আনা হয় আর শত্রু পিছন থেকে তার ওপর আক্রমণ করে। যাহোক তিনি যখন বাড়ি থেকে বের হন তখন হাফেয আলী রেযা ওরফে মুলাযেম হোসেন নামের এক আহমদী বিরোধী তার পিছু নেয় আর তার ওপর খঞ্জরের হামলা করে। তখন ছিল সন্ধ্যা বেলা। আক্রমণের ফলে আব্দুস সালাম সাহেব আঘাতের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে নিজের নিষ্পাপ দুই শিশু সন্তানের সামনে ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। (আক্রমণকারী) প্রথমে পিছন থেকে তার ওপর আক্রমণ করে, তার বৃক্ক কেটে ফেলে, এরপর তার পেটের নাড়িভুঁড়িতে আঘাত করে, অতঃপর তার হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে। যাহোক, তিনি ঘটনাস্থলে সন্তানদের সামনেই শহীদ হয়ে যান আর সেই অপরাধী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এই হত্যাকারীরা যারা জান্নাতের লোভে আহমদীদেরকে শহীদ করে, (এ ব্যক্তি) উকাড়া জেলার এল প্লটে অবস্থিত স্থানীয় মাদ্রাসা জামেয়া আমিনিয়া ফরিদিয়া-র একজন ছাত্র। আর ঘটনার দুদিন পূর্বেই মাদ্রাসা থেকে হিফ্য কোর্স সম্পন্ন করে বের হয়। মাদ্রাসার সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মাদ্রাসার ব্যবস্থাপক মৌলবি তার বক্তৃতায় সদ্য পাশ করা ছাত্রদের বলেছিল যে, আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে তোমাদের ব্যবস্থা নেয়া উচিত আর খুব উত্তেজিত করে এবং সবচেয়ে ভয়াবহ পদক্ষেপ গ্রহণেরও আহ্বান জানায়। যাহোক এরা যেভাবে মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যেতে চায় সেই পন্থা অনুসরণে তারা নিজেরাও জাহান্নামের পথ খুঁজছে আর মানুষকেও জাহান্নামের পথে পরিচালিত করছে।

শহীদ মরহুমের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা তার প্রপিতামহ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত নবী বখ্শ সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল, যিনি হুশিয়ারপুর জেলার অন্তর্গত ফামিয়া নিবাসী ছিলেন। শহীদের দাদা মুকাররম মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেব জন্মগত আহমদী ছিলেন। পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর তারা উকাড়ায় স্থানান্তরিত হন। শহীদ মরহুম মাধ্যমিক তথা মেট্রিক পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন, এরপর থেকে কৃষিকাজ করছিলেন। তিনি ওয়াকফে নও-এর আশিসময় স্কীমের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার মায়ের বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি যখন তাকে বলতেন, তুমিও ওয়াক্ফে নও, তোমার দুই ভাই মুরব্বী হয়ে গেছে অথচ তুমি হতে পারলে না, তখন তিনি উত্তরে বলতেন, আমি তাদের সেবা করছি। আল্লাহ্ তা'লা আমার এই সেবাকে কিছুটা হলেও গ্রহণ করবেন আর আমি যে কাজ করছি পুরো পরিবারের জন্য বা ঘরের সদস্যদের জন্য, কেননা তিনি কৃষিকাজ করে এবং নিজের অন্যান্য কাজের মাধ্যমে পুরো পরিবারের ব্যয়ভার বহন করেছেন, আর্থিকভাবে তিনি সবাইকে নিশ্চিন্ত রেখেছিলেন। ঘটনার সময়ও তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ হিসেবে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছিলেন আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায়ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (তথা ওসিয়্যতকারী ছিলেন)। খুবই মিশুক এবং সবার প্রতি আন্তরিক ছিলেন। যার সাথেই সাক্ষাৎ হতো, তাকেই আপন করে নিতেন। তার পরিচিত অ-আহমদীরাও একই কথা বলছিল যে, তার সাথে ভয়াবহ অন্যায় করা হয়েছে, কিন্তু উগ্রবাদী মোল্লার সামনে একথা বলার সাহস তাদের কারো নেই। পাকিস্তানে সততার কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হয়েছে।

যাইহোক, মরহুম সম্পর্কে তার ভাই ও আত্মীয়-স্বজনদের বিবৃতি হলো, খিলাফতের সাথে তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। বৈষম্যহীনভাবে অভাবী আহমদী এবং অ-আহমদীদেরকে নীরবে-নিভৃতে সাহায্য করতেন। আতিথেয়তা ছিল তার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় অতিথিদের সেবায় অগ্রগামী থাকতেন। তার আত্মীয়-স্বজন সবাই লিখেছেন যে, তিনি এক নির্ভীক এবং সাহসী যুবক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অতীতেও বিরোধীদের পক্ষ থেকে শহীদ মরহুমকে দুই ঈদেই সহিংসতার লক্ষ্যে পরিণত করা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাকে সেসময় রক্ষা করেছেন, তবে এবারের ঘটনা ছিল ভাগ্যের লিখন।

শহীদ মরহুম নিজের অবর্তমানে পিতা মোকাররম মাস্টার মুনাওয়ার আহমদ সাহেব, ওকাড়ার এল-প্লট জামা'তের প্রেসিডেন্ট এবং মা শমশাদ কাওসার সাহেবা ছাড়াও তার সহধর্মিনী ফারজানা ইরাম এবং তিনজন ছোট শিশুসন্তান যথাক্রমে ছয় বছর বয়স্ক ক্বমর ইসলাম, সাড়ে চার বছর বয়স্ক বদর ইসলাম এবং কন্যা স্নেহের সেহেরকে রেখে গেছেন যার বয়স ১ বছর ৬ মাস। শহীদ মরহুমের চার ভাই রয়েছেন যাদের মাঝে একজন হলেন রিসার্চ সেলে কর্মরত মুরব্বী সিলসিলাহ্ জনাব যহুর ইলাহী তৌকির সাহেব। আরেক ভাই হলেনমুরব্বী সিলসিলাহ্ হাফেজ আনোয়ার সাহেব। তিনিও পাকিস্তানে কর্মরত আছেন। এছাড়া আরও দু'ভাই আছেন যাদের একজন লন্ডনের অধিবাসী এবং অন্যজন আছেন রাবওয়াতে। তার বোন তিনজন, যাদের মাঝে একজন যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারের অধিবাসী। তিনি জিশান খালেদ সাহেবের সহধর্মিণী। আরেকজন কুয়েতে আছেন। তৃতীয় জনও লন্ডনে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা শহীদ মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চস্থান দান করুন। শহীদের নিষ্পাপ শিশু, সহধর্মিণী এবং পিতামাতা ও সকল আত্মীয়স্বজনের স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা সাহায্য ও তত্ত্বাবধান করুন। নিষ্পাপ শিশু সন্তানদের সামনে তাদের পিতাকে (নৃশংসভাবে) শহীদ করা হয়েছে, তাদের হৃদ য়ের যে কী অবস্থা হবে আর কী অনুভূতি- তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। শহীদের ৬ বছরের জ্যেষ্ঠপুত্র, যে কিছুটা বুঝতে শিখেছে, বলা হচ্ছে সে বর্তমানে একেবারেই বাকশূন্য। আল্লাহ্ তা'লাই তাদেরকে ধৈর্য এবং প্রশান্তি দিতে পারেন আর আল্লাহ্ তা'লাই ঐ শিশু সন্তানদেরও সুরক্ষা করুন এবং শত্রুকে তাদের কর্মের সমুচিত শাস্তি দিন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হবে ফয়সলাবাদের অধিবাসী প্রিয় যুলফিকার আহমদের যিনিশেখ সাঈদুল্লাহ্ সাহেবের সুপুত্র। তিনি সম্প্রতি ৩৬ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আযারবাইজানে একটি হোটেলে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি আযারবাইজান গিয়েছিলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তার প্রপিতামহ হযরত শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের মাধ্যমে, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত শেখ ঝাণ্ডা সাহেবের পুত্র ছিলেন। হযরত শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের কাদিয়ানে মসজিদে মুবারকের সাথে লাগোয়া মুদি দোকানছিল আর বয়আতের পর কাদিয়ানের নিকটবর্তী নিজ গ্রাম 'তাওয়াককুল ওয়ালা' থেকে তিনি কাদিয়ান হিজরত করেন।

একবার কেউ খলীফা আউয়াল হযরত মওলানা নূ রুদ্দীন সাহেব (রা.)-এর কাছে অভিযোগের স্বরে বলেন যে, মসজিদের সাথে লাগোয়া দোকান থাকা ঠিক না। হযরত মৌলবি সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এ বিষয়ে অবগত করলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এরা হলো আসহাবে সুফফা।

(আসহাবে আহমদ, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৮৭-১৮৯)

আর এসব আসহাবে সুফফা-কে আল্লাহ্ তা'লা সকল দিক থেকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন এবং তাদের বংশধরও বৃদ্ধি করেছেন। মরহুম ২০০৫ সালে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টেক্সটাইলে বি.এস.সি. ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। এরপর পারিবারিক ব্যবসা পরিচালনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। জাগতিক উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েও তিনি পরম বিনয় ও নম্রতার দৃষ্টান্ত ছিলেন। সকল স্তরের মানুষের সাথে তার মেলামেশা ছিল। প্রত্যেকের সাথে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতেন। তিনি প্রত্যেকের সাথে নিজের ভাই ও বন্ধুর মতো আচরণ করতেন। অধীনস্থ দের খুব দেখাশোনা করতেন এবং তাদের সাথে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল আচরণ করতেন। দান-সদকার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অগ্রগামী ছিলেন। এছাড়া তিনি হাসপাতাল প্রভৃতি দাতব্য কাজেও অংশ নিতেন। জামা'তী চাঁদার প্রতিটি খাতে অংশগ্রহণ করতেন, বরং নিজেই সেক্রেটারী মাল-কে স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, আমার চাঁদা নিন এবং প্রতিটি খাত সম্পর্কে অবহিত করুন। হিউম্যানিটি ফার্স্ট -এর কাজে তিনি অনেক অবদান রেখেছেন। মানুষের ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে দিয়েছেন। দরিদ্র দের বিয়েশাদীর খরচ বহন করতেন। কারো সাথে পরিচিত হলে তার কাছ থেকে উত্তম জিনিস শেখার চেষ্টা করতেন এবং নিজের জীবনে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করতেন। রমজান মাসে বিশেষভাবে সৃষ্টিসেবামূলক কাজ করতেন। মরহুম এবং তার পিতামাতা বেলিয-এ একটি মসজিদও নির্মাণ করিয়েছেন। এটি অনেক বড় প্রজেক্ট ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেখানে খুব সুন্দর একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। তার নামায সম্পর্কেও লেখা হয়েছে যে, কাজ বাদ দিয়ে তিনি সময় বের করতেন। কুরআন করীম তিলাওয়াত করতেন এবং নিজের জীবনকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাজিয়ে ছিলেন। মসজিদে যাওয়ার ওপর যখন বিধিনিষেধ আসে তখন তার ঘরে বাজামা'ত নামাযের ব্যবস্থা ছিল। তিনি একবার ভ্রমণের জন্য মালয়েশিয়া গিয়েছিলেন। সেসময় পুলিশ জামা'তের সদস্যদের আটক করে নিয়ে গেলে তিনিও কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ্র খাতিরে কারাবরণের সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুম তার অবর্তমানে স্ত্রী ও

খুতবার শেষাংশ শেষ পাতায়.....

আঁ হযরত (সা.)–এর প্রতি অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আহমদীদের করণীয়– হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)–এর নির্দেশাবলীর আলোকে।

সূচনালগ্ন থেকেই সত্য ও অসত্য ,আলো ও অন্ধকারের মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে এসেছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার রীতি অনুযায়ী চিরকাল আলোক তথা সত্যেরই জয় হয়েছে। কিছু মানুষ সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য খোদা তায়ালার রসুলের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করে থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা অসফল ও অকৃতকার্য হয়। তারা ইসলাম ও হযরত মহম্মদ(সাঃ) সম্পর্কে তারা অনেক অবমাননাকর আপত্তি করে অনেক অভব্য আচরণ করে এবং আল্লাহ তায়ালার সুন্নত অনুযায়ী অসফলতায় ব্যর্থ মনোরথ হয়। সম্প্রতিও অভিব্যক্তি ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতার ছুতোয় কিছু উপাদান ইসলাম ও আঁ হযরত (সাঃ) এর বিরুদ্ধে নিজেদের বিদ্বেষ উজাগর করতে এবং মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে অশ্লীল কার্টুন বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকায় প্রকাশিত করেছে। এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন ও ইসলামী দেশগুলিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। অগ্নি সংযোগ ঘটানো হয়েছে , ক্ষোভ প্রকাশের জন্য ভাংচুরও করা হয়েছে।

জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য হল খোদা তায়ালার কৃপা ও অনুগ্রহ লাভের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৃথিবীতে বিস্তার ঘটানো। এই কারণে এই সকল ক্ষেত্রে জামাতের প্রতিক্রিয়া অগ্নি সংযোগ ও ভাংচুর প্রদর্শনের পরিবর্তে নিন্দুকদের আপত্তি সমূহের সন্তুষ্টিজনক উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায় এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও বাণী মানুষের কাছে পোঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

তাই জামাতের আহমদীয়ার ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) বর্তমানের এই ঘটনাক্রম সম্পর্কে খুতবা জুমায় বিশদ আলোচনা উপস্থাপন করেন যা তিনি ১০ ফেব্রুয়ারী , ১৭ ফেব্রুয়ারী ,২৪ ফেব্রুয়ারী , ৩রা মার্চ ও ১০ মার্চ ২০১৪ মসজিদ বায়তুল ফুতুহ , লন্ডন –এ প্রদান করেছিলেন । বর্তমান পরিস্থিতিতে একজন প্রকৃত মোমিনের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া বাঞ্ছনীয় আর এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় এই খুতবাগুলি থেকে সে সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি। খুতবাগুলি থেকে চয়নকৃত অংশ উপস্থাপন করা হল।

তাই মুসলমান জনসাধারণের উচিৎ এই সকল মন্দ প্রকারের উলেমা ও নেতাদের পশ্চাদ্গামী না হয়ে , তাদেরকে অনুসরণ করে নিজেদের ইহকাল ও পরকাল নষ্ট না করে , বিবেক বুদ্ধি দিয়ে কাজ করা। আজ মুসলমানদের , বরং সমস্ত দুনিয়ার সঠিক গতিপথ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুল (সাঃ) এর প্রকৃত প্রেমিকে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে সনাক্ত করুন, তাঁর অনুসরন করুন, পৃথিবীর সংশোধন ও আঁ হযরত(সাঃ) এর পতাকা পৃথিবীতে প্রোথিত করার জন্য মসীহ ও মেহেদীর এই জামাতে সম্মিলিত হন, কেননা এখন আর অন্য কোনো উপায় নেই, অন্য কোনো পথ প্রদর্শক আমাদেরকে আঁ হযরত (সাঃ) এর সুন্নতের উপর চালিত করতে পারবেনা।

ইসলামের বৈভব ও মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখা এবং আঁ হযরত (সাঃ) এর পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করা মসীহ ও মেহেদীর জামাতেরই কাজ এবং অন্যদেরকেও এতে সম্মিলিত করতে হবে। ইনশাল্লাহ ।

মুসলমানদের ছত্রভঙ্গ অবস্থা ও দুর্বলতার মূল কারণ আঁ হযরত (সাঃ) কে অবজ্ঞা এবং মসীহ ও মেহেদীকে প্রত্যাখ্যান করা।

অতএব লক্ষ্য করুন , এখন এরা একে অপরকে হত্যা করছে কলহ সৃষ্টিকারী ও প্ররোরচনা দানকারী ঐসকল নেতাদের কথায়, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মীয় নেতা, এই সব কলহ সৃষ্টি হচ্ছে। পুণ্যার্জন ও জান্নাতের প্রলোভন দেখিয়ে হানাহানি, হত্যা ও লুণ্ঠন চলছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামে প্রবেশ করাচ্ছেন এবং অভিসম্পাত করছেন।

পাকিস্তান ,বাংলাদেশ বা আরও অন্যান্য দেশে যেখানে আহমদীদেরকেও শহীদ করা হয়, এরাই তাদেরকে জান্নাত লাভের প্রলোভন দেখিয়ে জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। যাই হোক আমি একথা বলছিলাম যে মুসলমানদের এই রকম গতিবিধির কারণেই মুসলমানদের শত্রুরা সুযোগ নেয়। এবং মুসলমানদের শক্তি হ্রাস হয়ে যাওয়া সত্বেও তাদের বিবেক জাগ্রত হয়না। যাই হোক এটা তো পরিস্কার যে মতিভ্রম আর এই লাঞ্ছনার কারণ হল আঁ হযরত (সাঃ) এর আদেশকে অবজ্ঞা করা এবং এখনও সেই আদেশকে মান্য করা হচ্ছে না। এদিকে আকৃষ্টও হচ্ছেনা এবং তাঁর (সাঃ) মসীহ ও মেহদীর প্রত্যাখ্যান করছে। আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়াই হল আমাদের একমাত্র উপায় যা প্রত্যেক আহমদীর করা উচিত।এর প্রতি পূর্বেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে খোদা তায়ালা তাদেরকে বুদ্ধি ও বিবেক দিক এবং এরা যেন এই সকল কপট ও ইসলামের শত্রুদের হাতের খেলনা হয়ে গিয়ে ইসলামের সুনাম হানির কারণ না হয় এবং একে অপরের মুণ্ডুপাত না করে বেড়ায়।

যাই হোক না কেন যখন ইসলামের শত্রুরা কোনো না কোনো উপায়ে এই সকল মুসলমানদেরকে বদনাম ও অপমান করার চেষ্টা করে তখন একজন আহমদী অবশ্যই মর্মাহত হয়। কেননা এরা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর সাথে সম্পৃক্ত বা সম্পৃক্ত হওয়ার দাবী করে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে এই সকল পথ হারানো মুসলমানদের একটি বিরাট সংখ্যা জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এই সব নেতা ও উলেমাদের কথায় এমন অনুচিত কর্মকান্ড ও গতিবিধি করে বসে, যার সঙ্গে ইসলামের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তায়ালা আমাদের দোয়া গ্রহণ করে এদেরকে এই সকল নামধারী উলেমাদের কবল থেকে নিষ্কৃতি দিক। এরা ইসলামের সুন্দর শিক্ষার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করুক। অজ্ঞাতসারে বা নির্বুদ্ধিতকার কারণে এবং ইসলামের প্রতি ভালবাসার উচ্ছ্বাসের কারণে ইসলামকে যেন কলুষিত করার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সহজ পথ দেখাক। কেননা এদের এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের কারণে শত্রুরা ইসলামের প্রতি দোষারোপ করার এবং আঁ হযরত (সাঃ) এর সত্তার উপর অবমাননাকর আক্রমণ করার সুযোগ পায়। অতএব প্রত্যেক আহমদীর আজকাল দোয়ার দিকে অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কেননা মুসলিম বিশ্ব নিজেদের ভুলের কারণে অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন। যদি আমাদের মধ্যে আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রতি সত্যিকারের অনুরাগ ও ভালবাসা থাকে তবে তাঁর অনুসারীদের জন্যও অনেক বেশি দোয়া করা উচিত।এর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন , যা পূর্বেও করে আসছি।

হযরত মসীহ মওউদ(আঃ)এর দৃষ্টিতে আঁ হযরত(সাঃ) এর সুমহান মর্যাদা

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আঁ হযরত (সাঃ) এর মর্যাদা সম্পর্কে আরও বলেন যে, :

" সেই উচ্চ মানের জ্যোতি যা মানুষকে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ পূর্ণ মানবকে , তা ফিরিস্তাগণের মধ্যে ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে ছিলনা, চন্দ্রে ছিল না,সূর্যে ছিলনা , তা পৃথিবীর মহাসমুদ্র সমুহে ছিলনা, নদী সমুহেও ছিলনা। তা পদ্মরাগমনি ও চুনি পান্নাতে, হীরে মোতিতেও ছিলনা। তা কোনো পার্থিব ও অপার্থিব বস্তুতেও ছিলনা। কেবল মাত্র মানুষের মধ্যে ছিল অর্থাৎ পূর্ণ মানবের মধ্যে"।

অতএব যারা নিজেদেরকে আঁ হযরত(সাঃ) এর প্রেমিক মনে করে তথাপি আমাদের উপর অপবাদ দেয় যে নাউজুবিল্লাহ আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কে তাঁর চায়তে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি, তবে এটা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এরা তাদের কোনো উলেমাদের মুখ থেকে আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রশংসা সূচক এই মানের বাক্য তো দূরাস্ত , এই মানের লক্ষ ভাগের একভাগও তারা উচ্চারণ করে দেখাক , যা আঁ হযরত(সাঃ) এর প্রশংসায় হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) বর্ণনা করেছেন। এগুলি আঁ হযরত (সাঃ) এর বরকতমন্ডিত সত্তা সম্পর্কে তাঁর সেই প্রকৃত প্রেমির কথা যাঁকে তোমরা মিথ্যাবাদী বল। এই ব্যক্তির সচল অচল প্রত্যেকটি অবস্থা তাঁর প্রভু ও অনুসরনীয় নেতা হযরত মুহম্মদ(সাঃ)এর আনুগত্যে ব্যতীত হয়েছে।আঁ হযরত (সাঃ)এর সত্বার বিষয়ে এমন গভীরতা ,জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় তোমরা নিজেদের লিটেরেচারে প্রদর্শন করে তো দেখাও যেরূপ হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) উপস্থাপন করেছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আরও বলেন এবং এটিই জামাতের জন্য সর্বদার শিক্ষা যার উপর এটি পরিচালিত হয়, সেটা হল এই যে আমরা আইনের মধ্যে থেকে সহন করে নিই। তিনি (আঃ) বলেন :– "আমাদের ধর্মের এটাই সারাংশ। কিন্তু যারা অন্যায়ভাবে খোদা তায়ালা সম্পর্কে নির্ভীক হয়ে আমাদের সম্মানীয় নবী হযরত মহম্মদ(সাঃ) কে নোংরা ভাষায় সম্বোধন করে এবং তাঁর উপর অপবিত্র অপবাদ আরোপ করে এবং গালমন্দ করা থেকে বিরত হয়না তাদের সঙ্গে আমরা কিরূপে সন্ধি করতে পারি। আমি সত্যি সত্যি বলছি যে আমরা মরুভূমির সাপ এবং জনমানবহীন জঙ্গালের নেকড়ে বাঘের সঙ্গে আপোস করতে পারি কিন্তু সেই সকল লোকেদের সঙ্গে আপোস করতে পারিনা, যারা আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) উপর অপবিত্র আক্রমণ করে, যিনি আমাদের প্রাণ ও মাতা পিতার

এরপর ১১ পাতায়

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই এলাকার মানুষের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যারা আমাদেরকে এখানে মসজিদ তৈরীর জন্য জায়গা দিয়েছেন আর কোনও আপত্তি ছাড়াই আমাদের নকশা অনুসারে মসজিদের মঞ্জুরি দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে প্রতিদান দিন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কিন্তু সেই সঙ্গে প্রত্যেক আহমদীকে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, যে-সব কথাগুলি আমি বলেছি সেগুলি যেন শুধু কথার কথা না হয়। আমি এই কথাগুলি এই প্রত্যাশা নিয়ে বলেছি যাতে এগুলির প্রভাব, এই চিন্তাধারা এবং আবেগ অনুভুতির বহিঃপ্রকাশ আপনাদের পক্ষ থেকে হতে দেখি। আর ইনশাআল্লাহ্ আপনারা এই মসজিদটি নির্মাণের মধ্য দিয়েই এই সমাজে আরও বেশি করে সমন্বিত হবেন আর এখনও চেষ্টা করুন চেষ্টা করুন ইসলামের ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব এবং শান্তির বাণী মানুষের কাছে পোঁছে দেওয়ার। যদি কারো মধ্যে কোনও রক্ষণশীলতা থাকে তবে তা দূর করার চেষ্টা করবেন আর নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের প্রসার ঘটাবেন। যাতে তারা জানতে পারে যে, এরা এমন মানুষ যারা একদিকে যেমন সম্প্রীতি সহকারে বাস করে, অপরদিকে অন্যদের বিষয়েও যত্নবান থাকার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ করুন আপনারা যেন এই চিন্তাধারা নিয়ে মসজিদ নির্মাণ করেন। এছাড়া এই মসজিদের নাম রাখা হয়েছে মসজিদ সুবহান। তাই আপনারা যেন নিজেদের অন্তরে পবিত্রতা বজায় রাখেন আর আল্লাহ্ তা'লার স্মরণে হৃদয় সিক্ত থাকে আর মসজিদের নির্মাণের জন্য প্রত্যেক যে ইট রাখা হবে তা যেন আপনাদের বিনয়কে আরও বাড়িয়ে দেয় আর আপনাদের ঈমানকে সমৃদ্ধ করে। আল্লাহ্ যেন প্রতিটি দিন এই পরিবেশে ইসলামের বাণী শ্রেষ্ঠতর উপায়ে পোঁছে দেওয়ার তৌফিক দান করেন।

****

বায়তুল আতা মসজিদের উদ্বোধন

জার্মানীর আমীর সাহেবের পরিচিতিমূলক বক্তব্য

মাননীয় আব্দুল্লাহ্ ওয়াগাস হাউযার সাহেব নিজেদের পরিচিতিমূলক ভাষণে শহরের ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন- ১৯৪৫ সাল থেকে এই শহর হেসেন প্রদেশের অন্তর্গত আর এই শহরের ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৮৮২ সালে। শহরের জনসংখ্যা ২০ হাজারের বেশি আর এখানে ১৮৩৯ সাল থেকে রেল স্টেশন আছে।

এই শহরে আহমদীরা ১৯৮৮ সাল থেকে বসবাস করছে আর ২০০৬ সাল থেকে মসজিদ তৈরীর চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এখানকার মেয়র সাহেব প্রথম থেকেই মসজিদ নির্মাণের বিষয়ে সাহায্য করেছেন। জামাতের এক সদস্য বিশেষভাবে হুযুরের নিকট দোয়ার পত্র লিখলে পরের দিনই ইন্টারনেটের মাধ্যমে জায়গাটি পাওয়া যায়। এই জায়গাটি প্রথমে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কিছু কারণ বশত পুনরায় সেটি পুনরায় খালি করে দেওয়া হয়। এভাবেই সেটি জামাতের হাতে আসে। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর দোয়ায় আমরা এই জায়গাটি লাভ করেছি আর সেই সঙ্গে ইতিপূর্বে বিক্রি হয়ে যাওয়া একটি বিল্ডিংও পেয়েছি। নগর প্রশাসনের সমস্ত বিভাগ এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করেছে আর পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ এগিয়েছে। এখানকার পত্রপত্রিকা এবং সংবাদমাধ্যমও আমাদের সাহায্য করেছে, জামাতের পক্ষে তাদের প্রতিবেনগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা তৈরী করেছে আর ইসলামের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

২০১২ সালের এপ্রিল মাসে ১৪২১ বর্গমিটার এই জায়গাটি তিন লক্ষ আশি হাজার ইউরো মূল্যে ক্রয় করা হয়। এই জায়গায় আগে থেকেই একটি বিল্ডিং ছিল যেটিকে এখন মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

মসজিদের একটি হলঘর ১৯৩বর্গ মিটার এবং অপরটি ১৭৫ বর্গমিটার। মিনারের উচ্চতা দশ মিটার আর গম্বুজের ব্যাস ৩.৬ মিট। মসজিদের যতটুকু অংশে ছাদ আছে তার আয়তন ৭৬৯ বর্গমিটার। মসজিদের দুটি হলে একত্রে ৬৩৬ জন নামায পড়তে পারে।

আমীর সাহেব বলেন: মসজিদের নির্মাণ প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ ইউরো এখানকার স্থানীয় জামাত বহন করেছে। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও নিজেদের গয়নাগাটি বিক্রি করে এই আর্থিক কুরবানীতে অংশগ্রহণ করেছে। একটি পরিবারে ১৭ বছর থেকে কোনও সন্তান ছিল না, তারা সেই সন্তানের নামেও চাঁদা দিয়েছিল যে এখনও অস্তিত্ব লাভও করে নি। আল্লাহ্ তা'লা সেই পরিবারকে ১৭ বছর পর এক পুত্র সন্তান দান করেছেন।

অনুরূপে মসজিদ নির্মাণে জামাতের সদস্যরা সামগ্রিকভাবে সাত হাজার ঘন্টা কাজ করেছেন। আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই এই সেবায় অংশগ্রহণ করেছে।

শহরের মেয়রের ভাষণ

শহরের মেয়র মি. মাইকেল আন্টারব্রিঙ্ক নিজের ভাষণের বলেন: সম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! আমি প্রশাসানের পক্ষ থেকে হুযুরকে মসজিদ উদ্বোধনের জন্য সাধুবাদ ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা খোদা তা'লার ভব্য এক ঘর তৈরী করেছেন যা প্রশংসনীয়। আনন্দের সাথে আপনারা এই ঘরটিকে ব্যবহার করতে পারবেন। আমি ভীষণ আনন্দিত আর খলীফাতুল মসীহ্র আমাদের শহরে আগমণ আমাদের শহরের জন্য অত্যন্ত আনন্দ এবং গৌরবের দিন। এই মসজিদ বলে দিচ্ছে যে আপনারা এই শহরের অংশ আর এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে চান। আপনাদের এই মসজিদ আপনারে সমন্বয়ের কারণ হবে আর এটা হবে এমন এক জায়গায় যেখানে অন্যান্য ধর্মের মানুষও একত্রে বাস করে আর নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে। আমার বাসনা, এখানেও কথাবার্তা হোক।

এই শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে খৃষ্টধর্মের গভীর শিকড় রয়েছে। কিন্তু তাদের মন ধর্মের জন্য উদার। তারা সকলের সঙ্গে উদার মনে মিশে আর এই মসজিদ নির্মাণের বিষয়ে তারা কোনও সমস্যা তৈরী করে নি আর প্রতিবেশীরাও কোনও প্রতিক্রিয়া দেখায় নি। জামাতে আহমদীয়ার সদস্যদেরকে এই শহরের মানুষ ভরসা করে।

আমি একথা জেনে ভীষণ প্রভাবিত হয়েছি যে, আপনারা সব সময় শান্তি, পরধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং দেশের প্রতি বিশ্বস্ততার কথা সর্বত্র প্রচার করেন। আজ আমি আনন্দিত যে, ,,,,, শহর এবং জামাত আহমদীয়া পরস্পর মিশে গেছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা এখানকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সব দিক থেকেই ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেকের নিজের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার স্বাধীনতা থাকা উচিত। খোদা এবং বান্দার মধ্যে যে সম্পর্ক সেটিকে নষ্ট করা উচিত নয়। আমাদের সাবেক সদর সাহেব বলেছিলেন, ইসলাম জার্মানীতে পোঁছে গেছে আর এটি এখন জার্মানীর একটি অংশ। এখন এখানে ইউনিভার্সিটিতে ইসলামি শিক্ষা পঠনপাঠনের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে এবং এর জন্য শিক্ষকদের প্রস্তুত করা হচ্ছে। ২০১৪ সাল থেকে লেকচার শুরু হয়ে যাবে।

মসজিদের বিল্ডিংটি খুব সুন্দর আর এর সু উচ্চ মিনার এখন ট্রেন থেকেও দেখা যাবে পদযাত্রীদেরও চোখে পড়বে। এই মসজিদ এখানকার মানুষের সংস্কৃতির অংশে পরিণত হবে। আমি আরও একবার এখানে উপস্থিত অতিথি এবং জামাতে আহমদীয়াকে সাধুবাদ জানাই।

শহর কাউন্সিলের সদরের ভাষণ

কাউন্সিলের সদর মি. ওডারমেট সাহেব বলেন- হিজ হলিনেস খলীফাতুল মসীহ, মেয়র এবং সম্মানীয় শ্রোতাগণ! জামাত আহমদীয়া ফ্লোরশেমের জন্য আজকের দিনটি অত্যন্ত কল্যাণমণ্ডিত দিন, কেননা আজ তারা জামাতের নতুন মসজিদ উদ্বোধন করছে। আপনারা আমাদের শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে অসাধারণ সুন্দর এক অট্টালিকা তৈরী করেছেন। আপনাদের এই ইমারত শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণ হবে। যেখানে আমাদের চারদিকে বিভিন্ন গীর্জার মিনার দেখা যাচ্ছে, এখন সেই সঙ্গে চার্চের পাশাপাশি আপনাদের মসজিদের মিনারও এই দৃশ্যের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মিনারের উপরের অংশে নীল রঙ দেওয়া হয়েছে। শহর প্রশাসনের এই নীল রঙটি ভীষণ পছন্দ হয়েছে। কেননা এটি আমাদের শহরের রঙ।

এই শহরের অনেকেই এখনও জামাতের সঙ্গে পরিচিত নয়। এখন এই মসজিদ নির্মাণের ফলে এর মধ্যে পরিবর্তন ঘটবে আর তারা জামাত সম্পর্কে প্রশ্ন করবে, আপনাদের মসজিদ পরিদর্শন করতে আসবে আর এভাবে আপনাদের পরিচিতি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

একথা নিশ্চিত যে, আহমদী কোনও প্রকার জুলুম ও উগ্রবাদ অবলম্বনের বিরুদ্ধে। আপনারা এখন হেসেন প্রদেশে আমাদের অংশ হয়ে

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

উঠেছেন। এখন আপনারাও স্কুলে ইসলামি শিক্ষার পঠনপাঠন শুরু করতে পারবেন। সবশেষে আমি আরও একবার আপনাদের জন্য দোয়া করব। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে আমাদের এই শহরের সংস্কৃতি ও সমাজকে উন্নত করার তৌফিক দান করুন।

জেলা কমিশনারের ভাষণ

জেলা কমিশনার মাইকেল সিরিয়াক্স নিজের ভাষণে বলেন- হিজ হলিনেস খলীফাতুল মসীহ এবং শ্রোতমণ্ডলী! আমি ভীষণ আনন্দিত যে আমি আপনাদের অতিথি হিসেবে মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছি। আমি খলীফাতুল মসীহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, এই জন্য যে তাঁর এক সক্রিয় জামাত আমাদের শহরে রয়েছে। আমরা উদার মনের মানুষ। আমাদের এলাকায় ১৫০ জাতির মানুষ বসবাস করে আর তারা সকলে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে মিলেমিশে বাস করে। আমরা আমাদের খৃষ্টধর্মের ভিত্তি নিয়ে গর্বিত, আমাদের গীর্জা অত্যন্ত সক্রিয়। আপনাদের জামাতও অত্যন্ত সক্রিয় ও সুসংহত। আমি আপনাদের দিকে আমার সাহায্যের হাত প্রসারিত করছি, যেখানেই প্রয়োজন হবে আমরা আপনাদের সাহায্য করব।

আমি বিশ্বাস করি, এখানকার খৃষ্টান জাতিও খোদার সাহায্য নিয়ে চেষ্টা করবে যাতে মানবজাতি উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হয়। এই বিষয়টি আমাদের উভয়ের মাঝে সমান। আমি চাই ফ্লোরাস হাইমের মানুষ মিলেমিশে নিজেদের সমাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করুক। আমরা নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখব।

আমরা এমন একটি বৃক্ষের সন্ধান পেয়েছি যা অত্যন্ত দীর্ঘজীবি যা জার্মানীদের মাঝে পারস্পরিক মৈত্রীবন্ধন, সম্প্রীতি এবং দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতার প্রতীক। তাই এখানে আপনাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি হোক এবং প্রসার ঘটুক। আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ।

হেসেন প্রদেশের সেক্রেটারী অফ স্টেট মি. রুডল্ফ ক্রিসজেলিট নিজের ভাষণে বলেন- হিজ হলিনেস খলীফাতুল মসীহ! আজকের এই মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত। এই উপলক্ষ্যে আমি প্রাদেশিক এসেম্বলী সদস্যবর্গ এবং মন্ত্রীবর্গের পক্ষ থেকে অভিনন্দন বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি। আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পূর্বে ২০১২ সালের ডিসম্বর মাসে জামেয়া আহমদীয়ার উদ্বোধনেও আমি উপস্থিত ছিলাম।

১৯৫৯ সালে ফ্রাঙ্কফোর্টে আপনাদের নুর মসজিদের উদ্বোধন হয়েছিল। সেই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্যার যাফরুল্লাহ খান সাহেবও এসেছিলেন।সেই সময় জার্মানীর জন্য এটি নতুন বিষয় ছিল, মসজিদ উদ্বোধন তাদের জন্য একেবারে আশ্চর্যের বিষয় ছিল। ১৯৫৯ সালের দীর্ঘ কয়েক দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। জার্মানী এখন এমন এক দেশে রূপান্তরিত হয়েছে যেখানে বিপুল সংখ্যক মুসলমান বাস করে আর তারা এখানকার সমাজের অংশ। আর জামাত আহমদীয়া এখানকার সমাজের সক্রিয় অংশ। মসজিদ উদ্বোধন এ বিষয়ের প্রমাণ যে জামাত আহমদীয়া আমাদের সমাজের এক সক্রিয় অংশ। এই মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে আপনারা এ বিষয়ের দায়িত্ব নিচ্ছেন যে আপনারা এই প্রদেশের সক্রিয় অংশ হতে চান আর এর উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চান।

আমাদের এখানকার নিয়ম হল এখানকার আইন সকলকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়। এই কারণে প্রত্যেকে নিজের নিজের ধর্ম অনুশীলন করে। সরকার এবং ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে ইসলামের বিষয়ে পড়ানো হবে। ২০০৯ সালে জামাতকে আমরা আহ্বান জানাই যে আপনারা আসুন আমাদের সঙ্গে মিলে এর ব্যবস্থা করুন। জামাত আমাদের সঙ্গ দিয়েছে। এখন জামাত আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ২০১৩ সালের আগস্ট মাস থেকে স্কুলগুলিতে ইসলামী শিক্ষা পড়ানো আরম্ভ হবে।

আমি আপনাদের জামাতকে অত্যন্ত সমীহ করি আর আমাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি এজন্যও আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আপনারা এমন অনেক অনুষ্ঠান করেছেন যার কারণে জনমানসে ইসলামের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ফুটে উঠেছে। আপনাদের খুদ্দামরা চ্যারিটি ওয়াক করেছে, পরের চ্যারিটি ওয়াকের জন্য আমি এখন থেকেই নিজের জন্য রেজিস্ট্রেশন করিয়ে রেখেছি।আপনারা উইযবাদনে দুঃস্থ শিশুদের সংগঠনকে সাহায্য করেছেন। সাফাই অভিযানের মাধ্যমে আপনারা আমাদের শহর ও বিভিন্ন এলাকায় সাহায্য করেন। আমি দোয়া করি, আপনাদের এই মসজিদ সার্বিকভাবে আশিস ও কল্যাণের কারণ হোক।

হুযুর আনোয়ারের ভাষণ

তাশাহুদ তাউয এবং তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন:

মসজিদ উদ্বোধন প্রসঙ্গে কিছু বলার পূর্বে আমি সমস্ত অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এখানে আসা প্রত্যেক অতিথিই আমাদের জন্য সম্মানীয়। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ তারা আহমদী মুসলমান নয়, তারা ভিন্ন ধর্মের অনুসারী, অধিকাংশই খৃষ্টান, তা সত্ত্বেও তাঁরা আমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। আর আমার জন্য এটি আরও বেশি আশ্চর্যের বিষয় যে, যখন আমি মার্কিতে প্রবেশ করলাম তখন দেখলাম সমস্ত আসনে এখানকার স্থানীয় লোকেরাই বসে ছিলেন, যারা আহমদী নয়, অথচ সচরাচর মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যেখানেই আমি যাই সেখানে আট-দশ জন স্থানীয় মানুষকেই বসে থাকতে দেখি। তাই হঠাৎ করে মনে হল, কোনও ভুল জায়গায় এসে পড়ি নি তো? হয়তো এমন কোনও স্থানে এসে পড়েছি যেখানে স্থানীয় লোকদের কোনও অনুষ্ঠান আছে। আর একথা জেনে আমি ভীষণ আনন্দিত যে, আজ যে মসজিদটি এখানে নির্মিত হয়েছে তাতে স্থানীয় মানুষদের অবদান এবং আগ্রহ রয়েছে। আর এই জিনিসটিই পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কের উন্নতিতে সহায়ক হয়। তাই আমার সামনে যে সমস্ত স্থানীয় মানুষ বসে আছেন আমি তাদেরকে মসজিদ নির্মাণ করার জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ্ এই মসজিদের দরজা সকলের জন্য, প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য খোলা থাকবে যে এক খোদার ইবাদত করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর আমি মেয়র সাহেবকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই। তিনি বেশ সুন্দর ভাষায় জামাতের পরিচয় তুলে ধরেছেন আর আমাদের মাঝে সম্পর্কের কথাও বলেছেন। আর এই জায়গাটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করতে যতদূর সম্ভব সাহায্য করেছেন। অতঃপর কাউন্সিল মেম্বারকেও ধন্যবাদ জানাই। আর আপনাদের সকলকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানিয়েছি এখানে আসার জন্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে যে বাজার ছিল সেখানে জিনিসপত্র কেনাবেচা হত, খাদ্যসামগ্রী বিক্রি হত। লোকেরা এখানে এসে নিজেদের চাহিদার সামগ্রী কিনে নিয়ে যেত। কিন্তু সেই জায়গায় এখন মসজিদ হয়েছে। এখানে যে জিনিস বিক্রি হবে যা বিতরণ করা হবে তার কোনও মূল্য নেই আর তা হল আধ্যাত্মিকতা এবং খোদার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। আর এটি এমন এক জিনিস যার দরুন আপনাকে কোনও অর্থ দিতে হয় না, অথচ তার থেকে কয়েক গুণ বেশি পুণ্যও অর্জিত হয়। অতএব, এই যে স্থানটি জাগতিক খাদ্যসামগ্রী জোগান দিত এখন সেটি আধ্যাত্মিক খাদ্য জোগান দিবে। জাগতিক খাদ্য অর্জনের জন্য আপনারা খরচ করতেন, আধ্যাত্মিক খাদ্য আপনি কোনও খরচ না করেই অর্জন করবেন, অথচ এর থেকে বেশি উপকারও লাভ করবেন। এই জিনিসগুলি আপনাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হবে। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতিতে এগিয়ে নিয়ে যায় আর আমি আশা করি, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা এই মসজিদ এই ভূমিকা পালন করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে ধর্মীয় সৌহার্দ্য এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার উল্লেখ করা হয়েছে। আমার পূর্বে এখনে শহরের অনেক সম্মানীয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এসেছেন। মেয়র সাহেব, সিটি কাউন্সিলের মেম্বারও নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা নিজেদের বক্তব্যে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সৌহার্দ্যের কথা বলেছেন। তাই সব সময় স্মরণ রাখতে হবে, যতদূর ধর্মীয় স্বাধীনতার সম্পর্ক, মসজিদ নির্মাণ একজন প্রকৃত মুসলমানকে ধর্মীয় স্বাধীনতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় না, বরং আল্লাহ তা'লার এই আদেশের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে ইসলামের বিরুদ্ধবাদী, যারা ধর্ম তথা খোদাকে অস্বীকার করে, যদি তাদের আক্রমণকে প্রতিহত না করা হয়, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ না করা হয়, তাহলে তোমাদের মসজিদ বা নিজেদের ইবাদতগাহকেই ধ্বংস করে ফেলবে না, বরং এই সব বিরুদ্ধবাদীদেরকে যদি ধর্মের উপর আক্রমণ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয় তবে কোনও গীর্জা, কোনও মন্দির, কোনও সিননাগগ বা কোনও ইবাদতখানাই নিরাপদ থাকবে না। তাই এভাবে আল্লাহ্ ইসলামে যখনই কারো বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছে তা কারো ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ভিত্তিতে দেওয়া হয় নি। বরং তা এজন্য ছিল যে ধর্মের শত্রুরা ধর্মকে ধ্বংস করে দিতে চাইত। অতএব, ইসলাম শিক্ষা দেয়, তোমরা কেবল নিজেদের ধর্ম ইসলামকেই রক্ষা করবে না, বরং

এরপর শেষের পাতায়

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

চাইতেও অধিক প্রিয় । খোদা তায়ালা আমাদেরকে ইসলামের উপর মৃত্যু দান করুক। আমরা এমন কর্ম করতে চাই না যার দ্বারা ঈমান বিলুপ্ত হতে থাকে।
(পয়গামে সুলাহ)

এই হল আমাদের শিক্ষা।এটা হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) প্রদত্ত শিক্ষা এবং এই হল আমাদের অন্তরের মাঝে আঁ হযরত (সাঃ) এর ভালবাসার প্রজ্জ্বলিত আগুন ও তার সঠিক বোধ ও জ্ঞান যা হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) আমাদেরকে প্রদান করেছেন। এর পরেও যদি একথা বলা হয় যে নাউজুবিল্লাহ কার্টুন প্রকাশনার বিষয়ে আহমদীরা পত্রিকা ও ডেনমার্কের সরকারকে উৎসাহিত করেছিল এবং তারপর তারা কার্টুন প্রকাশ করেছে,তবে আর কিছুই বলার থাকে না। এদের উপর আল্লাহ তায়ালার অভিসম্পাত ছাড়া আর কি বলা যায়।

মুসলমানদের মুষ্টিমেয় দলের ইসলামের বিপরীত কর্মধারা অমুসলিমদেরকে ইসলামের উপর আক্রমণ হানার সহায়ক হয়।

আঁ হযরত (সাঃ)এর সত্বার উপর অমুসলিমদের পক্ষ থেকে এই যে আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে তিনি(সাঃ) নাউজুবিল্লাহ এমন ধর্ম নিয়ে এসেছেন যার মধ্যে কঠোরতা , হত্যা ও লুটপাঠ ছাড়া কিছুই নেই। এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা এবং স্বাধীনতার ধারণাই নেই। এবং এই শিক্ষারই প্রভাব আজ অবধি মুসলমানদের স্বভাবের রূপ নিয়েছে। এই সম্পর্কে আমি পূর্বেও কয়েকবার বলেছি যে দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানদের মধ্যে থেকেই কিছু বর্গ ও শ্রেণী এই অবধারণার জন্ম দেওয়া ও প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে । এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মধারাই অমুসলিম বিশ্বে এবং বিশেষ করে পাশ্চাত্যে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ(সাঃ) সম্পর্কে অশ্লীল ও কুরুচিকর , অত্যন্ত অশোভনীয় এবং কদর্য চিন্তাধারা প্রকাশ করার সুযোগ তৈরী করেছে। যেহেতু আমরা জানি , কিছু শ্রেণী ও বর্গের কর্মধারা সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিকতা পরিপন্থী। ইসলামের শিক্ষা তো এমনই এক সুন্দর শিক্ষা যার সৌন্দর্য্য ও রূপে প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তি প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারেনা।

অমুসলিমদের সঙ্গে সদাচার সম্পর্কে ইসলামের অনুপম সুন্দর শিক্ষা

কুরান করীমের মধ্যে বহুবার ইসলামের এই সুন্দর শিক্ষার উল্লেখ পাওয়া যায় যার মধ্যে অমুসলিমদের সঙ্গে সদাচার , তাদের অধিকারসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়া , তাদের সঙ্গে সুবিচার করা, তাদের ধর্মের প্রতি কোনো ধরণের বলপ্রয়োগ না করা, ধর্মের বিষয়ে কোনো কঠোরতা না করা ইত্যাদি বহু আদেশাবলী আমাদের ছাড়াও অমুসলিমদের জন্য রয়েছে। তবে কোনো কোনো পরিস্থিতিতে যুদ্ধেরও অনুমতি রয়েছে , কিন্তু সেটা এই পরিস্থিতিতে যখন শত্রুরা আগাম পদক্ষেপ নেয় , চুক্তি ভঙ্গ করে , ন্যায়কে হত্যা করে , অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করে বা উৎপীড়ন করে , কিন্তু এক্ষেত্রে ও কোনো দেশের কোনো দল বা সংগঠনের অধিকার নেই বরং এটা সরকারের কাজ। সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে কি করা উচিৎ আর কিভাবে এই অত্যাচারকে প্রতিহত করা যায়। যে কোনো জেহাদী সংগঠন এসে এই কাজ করতে শুরু করে দিবে এটা বাঞ্ছনীয় নয়।

মক্কার কাফের ও ইসলামের শত্রুদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের জবাবে আঁ হযরত(সাঃ) এর মহান আদর্শ।

আঁ হযরত (সাঃ) এর যুগেও যুদ্ধের বিশেষ পরিস্থিতি তৈরী করা হয়েছিল।যার ফলে মুসলমানদেরকে বাধ্য হয়ে প্রতি-আক্রমণ স্বরূপ যুদ্ধ করতে হয়েছে। কিন্তু যেরূপ আমি বললাম যে বর্তমানের জেহাদি সংগঠনগুলি কোনো বৈধ কারণ ও বৈধ অধিকার ছাড়াই নিজেদের লড়াকু স্লোগান ও কর্মধারা দ্বারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে এই সুযোগ করে দিয়েছে এবং এদের মধ্যে এমন ধৃষ্টতা তৈরী হয়ে গেছে যে তারা বিভিন্ন সময়ে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে আঁ হযরত(সাঃ) এর পবিত্র সত্তার উপর অশালীন আক্রমণ করেছে এবং করে চলেছে। অথচ করুণা ও দয়ার মূর্তিমান প্রতীক তথা মানবতার পরম হিতৈষী ও মানবাধিকারের মহান রক্ষক এই সত্তা এমন ছিলেন যে তিনি(সাঃ) যুদ্ধ চলাকালীন এমন কোনো সুযোগ হাত ছাড়া করতেন না যা শত্রুদের জন্য সহজসাধ্যতা তৈরী করত । তাঁর(সাঃ) জীবনের প্রত্যেকটি কর্মধারা , প্রত্যেকটি কাজ ও প্রত্যেকটি ক্ষণ , প্রত্যেকটি মুহূর্ত একথার সাক্ষী যে তিনি মুর্তিমান করুনা ছিলেন। এবং তার বুকের মধ্যে এমন হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছিল যার থেকে বেশি দয়ালু আর কোনো হৃদয় করুনার সেই মানদন্ড ও দাবী পূর্ণ করতে সক্ষম নয় যা তিনি (সাঃ)সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ করেছেন- হোক সে শান্তি কিম্বা যুদ্ধ পরিস্থিতি, ঘরে কিম্বা বাইরে, প্রাত্যাহিক দিনচর্চা হোক কিম্বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি। অর্থাৎ তিনি(সাঃ) অভিব্যক্তির স্বাধীনতা , ধর্ম ও সহিষ্ণুতা ও উদারতার মানদন্ড প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর তিনি(সাঃ) যখন মহান বিজয়ী রূপে মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন একদিকে যেমন বিজীত জাতির প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করলেন অপরদিকে ধর্মের স্বাধীনতারও পূর্ণ অধিকার দান করলেন। এবং কুরান করীমের এই আদেশের শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। অর্থাৎ ধর্ম তোমাদের অন্তরের বিষয় , আমার তো এই আকাঙ্খা যে তোমরা সঠিক ধর্মকে স্বীকার করে নাও এবং নিজেদের পার্থিব ও পরলৌকিক জীবন সুন্দর করে তোলো, নিজেদের ক্ষমালাভের উপকরণ তৈরী কর, কিন্তু কোনও বলপ্রয়োগ নয়। তাঁর(সাঃ) জীবন উদারতা, এবং ধর্মীয় ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতার এইরূপ অগণিত উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ রয়েছে। আমি তার মধ্য থেকে গুটি কয়েকের উল্লেখ করব।

কার অজানা যে মক্কায় তাঁর(সাঃ) নবুয়তের দাবীর পরবর্তী ১৩ বছরের জীবন কত কষ্টকর ও দূর্বিষহ ছিল।এবং তিনি(সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণ(রাঃ) কত দুঃখ ও বিপদাবলী সহ্য করেছেন। ভরদুপুরে তপ্ত বালুকার উপর শোয়ানো হয়েছে। উত্তপ্ত পাথর তাঁদের বুকের উপর রেখে দেওয়া হয়েছে। চাবুকাঘাত করা হয়েছে। মহিলাদের পা দুখানি চিরে ফেলে হত্যা করা হয়েছে, শহীদ করা হয়েছে। তাঁর(সাঃ) উপর বিভিন্ন প্রকারের অত্যাচার করা হয়েছে। সিজদারত অবস্থায় অনেক সময় উঁটের দেহের পরিত্যক্ত নাড়ি ভুড়ি এনে তাঁর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যার ভারে তিনি(সাঃ) উঠতে পারতেন না। তায়েফের সফরের সময় ছোকরাদের দল তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করে ক্ষতবিক্ষত করছিল, অশালীন ও নোংরা ভাষায় গালি দিচ্ছিল, আর তাদের সর্দার তাদেরকে উকসানি ও মন্ত্রণা দিয়ে উত্তেজিত করছিল। তিনি এতটাই ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছেন যে আপাদ মস্তক রক্তাক্ত হয়েছেন, উপর থেকে রক্ত বেয়ে জুতো পর্যন্ত এসে গিয়েছে।

শেয়েবে- আব আবি তালিব এর ঘটনা।

তিনি(সাঃ) এবং তাঁর পরিবার ও মান্যকারীদেরকে কয়েক বছর যাবৎ অবরোধ করে রাখা হয়। কোনো খাদ্য ও পানীয় ছিলনা । বাচ্চারাও ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতরাচ্ছিল। কোনো এক সাহাবী এইরূপ অবস্থায় অন্ধকারে মাটির উপরপড়ে থাকা কোনও নরম বস্তু পায়ে অনুভূত হয় , তিনি সেটাকেই তুলে মুখে পুরেছেন, যে কোনও খাবার জিনিস হয়তো। ক্ষুধায় ব্যকুলতার এমন অবস্থা ছিল। অবশেষে এই অবস্থা থেকে নিরুপায় হয়ে যখন হিজরত করতে হয় এবং হিজরত করে মদিনায় আসার পর সেখানেও শত্রুরা পিছু ছাড়েনি , তারা আক্রমণ করেছে। তারা মদিনায় বসবাসরত ইহুদিদেরকে আঁ হযরত(সাঃ)এর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার চেষ্টা করে। এই সকল পরিস্থিতিতে , যেরূপ আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি , যদি যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং নিপিড়ীতরাও জবাব দেওয়ার সুযোগ পায় ,যদি প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পায় তবে এই চেষ্টাই করবে যে তবে যেন সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ অত্যাচারের দ্বারা নেওয়া হয়। বলা হয় যে যুদ্ধে সব কিছু বৈধ। কিন্তু আমাদের নবী (সাঃ) এমন পরিস্থিতিতেও কোমলতাও করুণার শ্রেষ্ঠতম মানদন্ড স্থাপন করেছেন। মক্কা থেকে আসার পর কিছু কালই অতিবাহিত হয়েছিল সমস্ত কষ্টের ক্ষত এখনও দগদগ করছিল । তিনি(সাঃ) নিজের কষ্টের চাইতে তাঁর মান্যকারীদের কষ্ট বেশি অনুভব করতেন। কিন্তু তথাপি তিনি (সাঃ) ইসলামী শিক্ষা এবং নীতি ও নিয়মাবলী ভঙ্গ করেননি। যে নৈতিক মানদন্ড তাঁর স্বভাব ও শিক্ষার অঙ্গ ছিল তা কখোনো ভঙ্গ করেননি।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 23 June, 2022 Issue No. 25

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

খুতবার শেষাংশ ৭ পাতার পর.....

দু'টি সন্তান ছাড়া পিতামাতা, পাঁচ ভাই এবং এক বোন রেখে গেছেন। তার মাতা আসেফা সাঈদ সাহেবা ফয়সালাবাদ জামা'তের লাজনার সদর। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্য ও মনোবল দান করুন।

ডাক্তার হামেদ মাহমুদ সাহেব তার সম্পর্কে লিখেন যে, আহমদীয়াত বিশেষত খিলাফতের সাথে তার গভীর ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। নিজের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষের সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। আর যাদের সাহায্যের প্রয়োজন হতো উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তাদের সেবা করা নিজের দায়িত্ব জ্ঞান করতেন। কাউকে কষ্টে নিপতিত দেখে সংগোপনে তার সাহায্য করাও দায়িত্ব মনে করতেন। সর্বোচ্চ নীরবতা এবং কোন আত্মপ্রদর্শন ছাড়াই এই কাজ করার চেষ্টা করতেন।

ডাক্তার মাসউদুল হাসান নূরী সাহেব বলেন, যুলফিকার অনেক নেক, মর্যাদাবান এবং নিষ্ঠাবান আহমদী যুবক ছিলেন। তিনি বলেন, তার সাথে আমার পরিচয়ের পর থেকেই আমি তার অসাধারণ গুণাবলী, যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হই। হিউম্যানিটি ফার্স্ট -এর আহ্বানে তিনি প্রতিযোগিতামূলকভাবে আর্থিক কুরবানী করতেন। তার কুরবানীর প্রেরণা এবং দানশীলতার মান অনেক উন্নত ছিল। লাখ লাখ রূপি (অকাতরে) দিয়ে দিতেন। এর পাশাপাশি বিনয় ও নম্রতাও প্রদর্শন করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন। তার পিতামাতা এবং স্ত্রীকেও ধৈর্য ও মনোবল দান করুন। সন্তানদের সুরক্ষা করুন এবং তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সামর্থ্য দান করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো কানাডার মুকাররম মালেক তাবাসসুম মাক্বসুদ সাহেবের যিনি কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তার পিতা মালেক মাক্ব সুদ আহমদ সাহেব ২৮ মে ২০১০ সালে দারুয্ যিকর লাহোরে সংঘটিত হামলায় শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তার পিতা মালেক মাক্ব সুদ আহমদ শহীদ সাহেবের নানা ভূপাল নিবাসী হযরত মালেক আলী বখশ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিয়ালকোটের লেকচার শুনে বয়আত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মালেক তাবাসসুম মাক্ব সুদ সাহেব ১৯৯১সালে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ২০০৬সালে তাকে নাযারাত উমুরে আমায় পদায়ন করা হয়। তিনি সেখানে নায়েব নাযের উমুরে আমা হিসেবে সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। এরপর ২০১১সালে তাহরীকে জাদীদ দপ্তরে তাকে আইন উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ২০১৬সালে আমার অনুমতিক্রমে পুনরায় শহীদদের পরিবারবর্গের সাথে তিনি কানাডা চলে যান। প্রথমে তিনি যেতে চাননি, কিন্তু আমার নির্দেশের পর চলে যান। কানাডায়ও তিনি উমুরে আমা এবং জায়েদাদ বিভাগসমূহে সেবা করার পাশাপাশি নাযেম দারুল কাযা হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুম নিয়মিত নামায-রোযায় অভ্যস্ত , নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী, কুরআন প্রেমী ও খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন এবং যুগ খলীফার আহ্বানে সর্বদা সাড়া দিতেন। খুবই পুণ্যবান এবং সহানুভূতিশীল মানুষ ছিলেন। মরহুম তার অবর্তমানে মা এবং স্ত্রী ছাড়াও এক পুত্র এবং তিন কন্যা রেখে গেছেন। তার একমাত্র পুত্র ডাক্তার আতহার আহমদ ওয়াকফে জিন্দেগী এবং তার জামাতা উমর ফারুক সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্ । মরহুম লাহোর জেলার আমীর মালেক তাহের আহমদ সাহেবের ভাতিজা ছিলেন।

তার কন্যা রাযিয়া তাবাসসুম লিখেন, তবলীগের প্রতি তার বিশেষ অনুরাগ ছিল। এক রাতে তিনি তবলীগ করতে যান। সেখানে দুষ্ট ছেলেরা তার ওপর আক্রমণ করে বসে। সেখান থেকে কোনভাবে বেরিয়ে আসেন, কিন্তু সেই মারধরের একটি ঘুষি তার চোখে লেগেছিল। চোখে আঘাত নিয়েই অনেক কষ্টে তিনি বাড়িতে পৌঁছেন, কিন্তু কাউকে বলেননি। কয়েক বছর পর চোখে যখন পুনরায় সমস্যা দেখা দেয় তখন ডাক্তারকে দেখালে ডা. বলেন, এটি পুরোনো কোনো আঘাতের ফলে হয়েছে। তখন তিনি বলেন, এভাবে একটি ঘটনা ঘটেছিল। যাহোক এ বিষয়ে তিনি আনন্দিত ছিলেন যে, আমার দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বাণী পৌঁছাতে গিয়ে হয়েছে। মালেক তাহের আহমদ সাহেব লিখেন, তাবাসসুম মাক্ব সুদ সাহেব ছোটবেলা থেকেই পুণ্যকাজের প্রতি আগ্রহ রাখতেন। সাংগঠনিক এবং জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে কাজ করতেন। খিলাফতের সাথে গভীর সম্পৃক্ততা ছিল এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার আনুগত্য ছিল তার বৈশিষ্ট্য। অসম্ভব বিনয়ী এবং আল্লাহ্র ওপর ভরসাকারী ছিলেন। সন্তানদের অতি উত্তম তরবিয়ত করেছেন এবং খিলাফত ও নেযামে জামা'তের সাথে তাদের দৃঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকল্পে অনেক পরিশ্রম করেছেন। নায়েব ওকীলুল মাল-২ হাফেয মুহাম্মদ আকরাম কুরায়শী সাহেব বলেন, আমার তার সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। প্রতিবেশির সম্পর্কও ছিল। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত, সচেতন, সহানুভূতিশীল, সৃষ্টির সেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, খিলাফতের প্রেমিক ছিলেন। খোদা তা'লার সত্তায় তার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল। একবার আমি দেখেছি, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লার তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে বুঝাচ্ছিলেন। তখন আমি দেখি যে, খোদা তা'লার ভালোবাসা এবং তাঁর মাহাত্ম্যের স্মরণে তার চোখ অশ্রুসিক্ত ছিল। তিনি আরও লিখেন, তার সহকর্মী আমাকে বলেছে, তিনি আমাকে বলতেন যে, আমার উপদেশ হলো, কে কি করছে এটি দেখো না, কারো কথা শুনবে না। কেবলমাত্র নিজের ঈমানের সুরক্ষা কর। খিলাফতের আঁচল ছাড়বে না। এটি ছাড়া কোথাও নিরাপত্তা নেই। খোদ্দামুল আহমদীয়ার যুগে জামা'তের সাথে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল এবং নিজ ধন-প্রাণ-সময় এবং সম্মানের কু রবানীর ক্ষেত্রে সর্বদা অগ্রগামী ছিলেন। এছাড়া টগবগে যুবক ছিলেন, সদা সোচ্চার-সচেতন ছিলেন। শক্তিশালী, দীর্ঘকায় ক্রীড়াবিদ ছিলেন, আর যত যোগ্যতা ছিল জামা'তের সেবায় ব্যয় করেছেন। ছোট বয়সেই সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিসের লাইসেন্স পেয়েছিলেন। বিভিন্ন ধরনের কাজ সমাধায় তার অসাধারণ অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা ছিল এবং পৃথিবীময় ভ্রমণও করেছেন। এটি নয় যে, কেবল নিজ জগতেই থাকতেন, বরং সর্বদা বিনয় প্রদর্শন করতেন, কখনো স্বার্থপরতা বা আত্মম্ভরিতা ছিল না।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরও তার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দিন।

****

১ম পাতার পর.....

গ্রহণ করতে পারে? কাজেই মানুষ যেহেতু পুণ্যকর্মে উন্নতি করে আত্মীয়স্বজনদের সাহায্য নিয়ে, সেই কারণে তার পুরস্কারে তাদের অংশ রাখা হয়েছে আর এই নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে যে পুরো পরিবারে যে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী, অন্যরা সকলে তার কাছেই থাকবে।.....

'জাওজুন' শব্দ এই আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। আমার মতে এখানে এর অর্থ সঙ্গী, এর অর্থ পুরুষ কিম্বা স্ত্রী নয়। আর আমার মতে সই সব লোকও এর অন্তর্গত যারা পুণ্যকর্মে তাদের সহায়ক হয়েছে, কেবল স্বামী স্ত্রীকেই এখানে বোঝানো হয় নি। মহিলাদেরকে নবুয়তের মর্যাদা পর্যন্ত কেন পৌঁছানো হয় নি-এই আয়াত মহিলাদের সম্পর্কে প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছে। কেননা এই আয়াতের অর্থ, নবীদের স্ত্রীদেরকেও সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হবে যে মর্যাদায় নবী অধিষ্ঠিত থাকবেন। অর্থাৎ- যদিও তাদের গঠন প্রকৃতির কারণে তাদেরকে পৃথিবীতে নবী বানানো হয় না, কিন্তু তারা সেই সকল পুরস্কাররাজির অংশীদার হবে যা আম্বিয়াগণ প্রাপ্ত হবেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.) একক ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু এগারো জন স্ত্রী তাঁর পুরস্কাররাজির অংশীদার হবেন। অনুরূপভাবে নবীর সঙ্গী সিদ্দিকের মর্যাদায় বিভূষিত হন, আর মহিলাদেরকে সিদ্দিকের মর্যাদা লাভে বাধা দেওয়া হয়নি। যে সকল মহিলা সিদ্দিকিয়াত -এর মর্যাদায় পৌঁছয়, তাদেরকেও রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে, যেভাবে অন্যান্য সকল সিদ্দিকদের পৌঁছে দেওয়া হবে। কেননা তারা সিদ্দিকিয়াত'-এর মর্যাদা নিয়ে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ আয়াত দ্বারা একথা বোঝানো হয় নি যে জান্নাত এক সুবিশাল স্থান যার একাধিক প্রবেশ পথ আছে। এর অর্থ, সেই সকল সৎ গুণাবলী এবং পুণ্যকর্ম, যেগুলির কারণে মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে, পরকালে সেগুলিই জান্নাতের দরজা সদৃশ হয়ে দেখা দিবে।'

(তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৪১২)

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১১২)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir